স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৮ম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৯

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ❑ ডা. কুশল সেন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা.অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা.আশীষ কুমার কুণ্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা.দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা.শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা.সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ মনোজ দে, গোপাল সরকার, ডা. কুশল সেন, দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

ক্যান্সার, প্রতিরোধই উত্তর—কিন্তু, কোন পথে?

ক্যান্সার হবার আগে ঠেকাতে পারলেই ভালো। কিন্তু দিনে দিনে ক্যান্সার রোগে বাড়ছে মৃত্যু। রোগ ঠেকানোর জন্য যেটুকু সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টা দেখা যায় তার উদ্দেশ্য হল রোগীকে বোঝানো যে, রোগ আটকানোর দায়িত্ব তাঁরই কেবল। প্রতিরোধ কোন পথে? লিখেছেন **ডা. বিষাণ বসু**। ৪

বিনাইন প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট (Benign Prostate Enlargement)

পুরুষমানুষের বয়স বাড়লে প্রায়ই শুরু হয় প্রস্রাবের নানারকম অসুবিধে। অনেক ভাবেন ডায়াবেটিস। সংকোচে সহজে ডাক্তারের কাছে যান না অনেকে, কেউ কেউ আবার বুঝতেই পারেন না কার কাছে যাবেন। এগুলো প্রস্টেট বাড়ার সমস্যা, একটা খুব সাধারণ রোগ—লিখেছেন **ডা. মৃন্ময়**। ১১

আর এক স্টোনের কাহিনি

গলব্লাডারে পাথর বা কিডনির পাথর যেমন পরিচিত, মূত্রথলির পাথর তেমন নয়। কিন্তু নারী-পুরুষ-বাচ্চা সব মানুষই এই পাথরের খপ্পরে পড়লে ভোগান্তির একশেষ। সময়ে চিকিৎসা না হলে সমস্যা বাড়ে—লিখেছেন **ডা. অনিন্দিতা**। ১৪

এইচআইভি ও দুই মহিলা ডাক্তার

সারা বিশ্বে এইচআইভি/এইডস নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে মোটামুটি ত্রিশ বছর। ভারতে রোগটাকে খানিক আটকিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো গেছে। যে সময়ে আমাদের দেশে কেউ এ রোগের কথা ভাবেননি, তখন রোগটার অস্তিত্ব প্রথম শনাক্ত করেন দুই মহিলা ডাক্তার, সেলাপ্পান নির্মলা আর সুনীতি সলোমন। তাঁদেরকে আমরা মনে রাখিনি, এই আবিষ্কারের গল্পের সঙ্গে যে সংগ্রাম ও নিষ্ঠা জড়িয়ে আছে তা আজও অজানা। —লিখেছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**। ২৫

স্তন্যদানের রাজনীতি, স্তন্যদানের অধিকার

সম্প্রতি কলকাতার এক অভিজাত মল-এ এক মা তাঁর শিশুকে স্তন্যপান করাতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের আপত্তির মুখে পড়েন। মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্য অমূল্য একটি পুষ্টি-উৎস। শিশুর দৈহিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে মায়ের দুধের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে, নিজের শরীরের উপর নিজের অধিকারের প্রশ্নটি, তার সমস্ত জটিলতা সমেত, স্তন্যদানের সঙ্গে জড়িত—লিখেছেন **শতাব্দী দাশ**। ৩০

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়		৩
ক্যান্সার, প্রতিরোধই উত্তর—কিন্তু, কোন পথে	ডা. বিষাণ বসু	৪
মুখের ভেতরের ক্যান্সার	ডা. কুশল সেন	৮
বিনাইন প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট (Benign Prostate Enlargement)	ডা. মৃন্ময়	১১
আর এক স্টোনের কাহিনি	ডা. অনিন্দিতা	১৪
“বাচ্চা কিছু খায় না”	ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা	১৭
খিঁচুনি হলে কী করবেন?	ডা. সুমিত দাশ	১৯
মন নিয়ে কথকতা	ডা. স্বস্তিশোভন চৌধুরী	২১
আমি আসছি	রুমঝুম ভট্টাচার্য্য	২৩
কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে	মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন	২৪
এইচআইভি ও দুই মহিলা ডাক্তার	ডা. শর্মিষ্ঠা দাস	২৫
স্তনদুগ্ধ ও কয়েকটি তথ্য	ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা	২৮
স্তন্যদানের রাজনীতি, স্তন্যদানের অধিকার	শতাব্দী দাশ	৩০
ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬
ভিখারি বুড়ির গল্প	ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক	৪১
ডা. নন্দ ঘোষের চেম্বার	ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা	৪৪
টুকরো খবর		
ক্যান্সার চিকিৎসার নতুন ব্যবস্থা প্রোটন থেরাপি		৭
উত্তরপ্রদেশে শিশু মৃত্যু		১৮
উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে নবজাতকের মৃত্যুর হার, সাব-সাহারান আফ্রিকার থেকেও বেশি		২৯
সময়ের আগে জন্মানো শিশুদের মৃত্যু হার কমাতে নতুন নির্দেশিকা		৪৫
আশার আলো দেখালেন এইমসের বিজ্ঞানীরা: মাত্র ৩৫০০০ টাকায় এবার পাওয়া যাবে ভেন্টিলেটর		৪৬
ভারতে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচ পৃথিবীতে সবচেয়ে কম		৪৬
ডাক্তারের কাজের চাপ ও রোগীর নিরাপত্তা	ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত	৪৭
ঝাড়গ্রামে শবর মৃত্যু	পিয়ালী দে বিশ্বাস	৫০
বেসরকারি হাতে সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল		৫২
বই পড়া		
অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও ভাবাদর্শের ফল	প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়	৫৪

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলে-র স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা ৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভুম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ফোন ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২)
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

স্বাস্থ্যের বৃত্তের গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-

এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭

আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে

Swasthyer Britto

A/c No. 0315101025024

Canara Bank, Princep Street Branch

IFS Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম-ঠিকানা, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

ক্যান্সার বেড়েই চলবে, যদি না . . .

সরকারি মতে ভারতে এখন ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা কমপক্ষে ২৫ লক্ষ। প্রত্যেক বছর নতুন করে ক্যান্সার হচ্ছে আরও ৮-৯ লক্ষ, মারা যাচ্ছেন প্রায় লাখ চারেক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আশঙ্কা, ২০৩০ সাল নাগাদ এ দেশে প্রতি বছর এক কোটির বেশি মানুষ মারা যাবেন ক্যান্সারে, প্রত্যেক পরিবারে গড়ে একজন ক্যান্সার রোগী থাকবেন।

বিংশ শতকের গোড়া থেকেই জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে সংক্রামক রোগে মানুষের মৃত্যু কমতে থাকে। উন্নত দেশগুলিতে মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় অসংক্রামক দীর্ঘস্থায়ী অসুখ, যেমন হৃদ্‌রোগ বা ডায়াবেটিস। আমাদের দেশে টিবি-ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু হয়, কিন্তু আগের চেয়ে কম। আর হৃদ্‌রোগ ও ডায়াবেটিস ক্রমশ বাড়ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এইসব অসংক্রামক দীর্ঘস্থায়ী অসুখ সারানো যায়নি, কিন্তু মৃত্যুর হার কমছে, মানুষের আয়ু বেড়েছে। বাড়ছে বড়ো ওষুধ কোম্পানি ইত্যাদির লাভ।

অধিকাংশ ক্যান্সারের ঝুঁকি বয়স বাড়ার সঙ্গে বাড়ে, বাড়ে পরিবেশ-দূষণের ফলে। তাই ক্যান্সারের হার বেড়েছে। এ-রোগ হয়েছে জানতে পারলে মানুষ ঘটিবাটি বেচেও চিকিৎসা করেন। ক্যান্সার হলে স্বাস্থ্যব্যাবসায় জড়িত কোম্পানিগুলোর অনেক লাভ। তারা ক্যান্সার কমানো ও সারানোর গবেষণায় টাকা ঢালে, সরকার তার দোসর।

১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন শুরু করলেন শুধুমাত্র চিকিৎসা করেই ক্যান্সার নিশ্চিহ্ন করার যুদ্ধ। গুটিবসন্ত থেকে পোলিয়ো, কোনো রোগ এভাবে নির্মূল হয়নি, এমনকী টিবি-ম্যালেরিয়ার মতো রোগ কেবল চিকিৎসা করে কমেনি। ফলে প্রায় অর্ধশতক পরেও ডলার খরচ হল বিস্তর, ক্যান্সার নির্মূল হল না, সংখ্যায় বাড়ল, বাড়ল ক্যান্সারে মৃত্যুর হার।

ক্যান্সার হলে বড়ো কর্পোরেটের বড়ো লাভ। নিত্যনতুন দামি চিকিৎসা, দামি ওষুধ, দামি মেশিন, দামি রোগনির্ণয় পদ্ধতি, দামি হাসপাতাল। অন্যদিকে ক্যান্সার ঠেকাতে গেলে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, গাড়ি, বিলাসদ্রব্য এসবের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তাতে বড়ো কর্পোরেটের বড়ো ক্ষতি। কাজেই রোগ প্রতিরোধের কথা ভাবা হল না। এক বিজ্ঞানীর কথায়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ক্যান্সার গবেষণার দিশা খারাপ কলমিস্ত্রির মতো। কল থেকে জল পড়ে পুরো বাথরুম ভেসে যাচ্ছে। বিজ্ঞান গবেষণা করছে কেমন করে দ্রুত সেই জল সরিয়ে বাথরুম শুকনো করে ফেলা যায়। কিন্তু কী করে কল থেকে জল পড়া বন্ধ করা যায় সেটা ভাবা মানা।

আমাদের দেশও হাঁটছে এই পথে। ভারতের ন্যাশনাল ক্যান্সার কন্ট্রোল প্রোগ্রাম শুরু হয় ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে। প্রথম দু-দশক যথাযথভাবেই জোর ছিল স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ানো এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগনির্ণয়ে। অর্থাৎ রোগপ্রতিরোধে কিছুটা নজর ছিল। বহুজাতিক কর্পোরেটের প্রভাবে ধীরে ধীরে রোগপ্রতিরোধের বিষয়টি চলে গেল পিছনের সারিতে। ২০০৫ সাল থেকে শুরু হল আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্র—যেখানে চিকিৎসা আছে, রোগপ্রতিরোধে গুরুত্ব নেই। হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজগুলিতে জোর দেওয়া হল অঙ্কোলজি বিভাগ তৈরিতে। এখনও এরকমই চলছে।

আর প্রাথমিক রোগপ্রতিরোধের দায়িত্ব ছাড়া হল ব্যক্তি নাগরিকের উপর। অর্থাৎ, সরকার তামাক বা মদ্যজাত নেশার জিনিস নিষিদ্ধ করবেন না, কিন্তু, ব্যক্তি নাগরিককে সর্বদাই সচেতন করবেন তাঁর ক্ষতি নিয়ে। টাটকা আর রাসায়নিকমুক্ত খাবার খেতে নাগরিকদের বলবেন প্রতিনিয়ত, খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার কমাতে কোনো প্রচেষ্টাই করবেন না। কিন্তু আমরা নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে যতই সচেতন করি না কেন, জাতীয় স্তরে ক্যান্সার তেমন কমবে না, বড়ো ব্যবসায়ীদের লাভও কমবে না। কর্পোরেটদের পক্ষ ছেড়ে জনসাধারণের স্বার্থ সরকার তখনই দেখবেন যখন ক্যান্সার ও জনস্বাস্থ্য একটি গণদাবি হয়ে উঠবে।

এখনকার ব্যবস্থায় লাভের গুড় খাবে কর্পোরেট বহুজাতিক, তার বিষক্রিয়ার দায় সরকার চাপাবেন নাগরিকের ঘাড়ে। বহুজাতিকের লোভে খাবারে, জলে, বাতাসে বিষ—আমার-আপনার ক্যান্সার হবে। সরকার টিভিতে বিজ্ঞাপন দেবেন, আমাকে-আপনাকে সচেতন হওয়ার উপদেশ দেবেন। ক্যান্সার হলে দোষ চাপাবেন আমাদের ঘাড়ে।

ক্যান্সারের ব্যাবসা বেড়ে চলবে।

ক্যান্সার, প্রতিরোধই উত্তর—কিন্তু, কোন পথে?

ডা. বিষাণ বসু

সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। আর (রোগের) চিকিৎসার চাইতে (রোগ) প্রতিরোধ। কথা দুটো সবাই জানেন, পারতপক্ষে মানেনও।

আর, রোগটা যদি ক্যান্সার হয়, তাহলে তো কথাই নেই। একবিংশ শতকে ক্যান্সার মানেই যে "নো আন্সার" নয়, সেইটা সবার কানে না পৌঁছালেও, সেই চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা খরচের খবর সবাই রাখেন। কাজেই, এই নিয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই, যে ক্যান্সারের প্রতিরোধের বিষয়টি জরুরি।

ধরুন, পাহাড়ের উপর একটি ছোটো পার্ক আছে। খাদের দিকটা অরক্ষিত। প্রায়শই মানুষ খাদে পড়ে যান। সমস্যার সমাধানে আপনি দু-ধরনের কাজ করতে পারেন। এক, খাদের শেষে প্রচুর অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখতে পারেন, যাতে পড়ে যাওয়া মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে অতি দ্রুত। আর দুই, একখানা রেলিং দিয়ে ঘিরে দিতে পারেন খাদের দিকখানা, যাতে মানুষ চট করে পড়ে যেতে না পারেন।

গল্পটা আমার নয়, বেশ কিছু দশক আগেই বলেন ডেনিস বারকিট। আর, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপও করেন এই বলে যে, ক্যান্সারের মতো একটি অসুখের ক্ষেত্রে, আমরা সহজ রেলিংটি বানানোর কথা না ভেবে, উত্তরোত্তর মহার্ঘ অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্সের আয়োজন করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। হ্যাঁ, এই ডেনিস বারকিট-ই সেই প্রথিতযশা শল্যচিকিৎসক, যিনি সর্বপ্রথম খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্কের কথাটি দুনিয়ার সামনে এনেছিলেন, আর খাদ্যাভ্যাসে কী বদল আনলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে, সেই দিকেও আলোকপাত করেছিলেন।

তাহলে?

খোলাবাজারের ধনতান্ত্রিক মুক্ত অর্থনীতির দুনিয়ায় দেশের সরকারের মুখ্য অ্যাজেন্ডা, প্রায়শই, বহুজাতিক কর্পোরেটের স্বার্থরক্ষা। যদিও, এই স্বার্থের বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ, মুখে সাধারণ নাগরিকের স্বার্থরক্ষার কথা বলেও, আসল লক্ষ্য অন্যত্র। এই কাহিনি শুধু এই দেশের নয়, বিশ্বের সর্বত্রই একই চিত্র।

কথাটা অহেতুক বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে? চলুন, আরেকটু বিস্তারেই বলি।

বিগত শতাব্দীর গোড়া থেকেই জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সুবাদে, সংক্রামক ব্যাধিতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কমতে থাকে। হ্যাঁ, এই মৃত্যুহারের হ্রাসের সূচনা অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের আগে থেকেই। তার পর থেকেই, অন্তত উন্নত দেশগুলিতে, মানুষের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় অসংক্রামক ক্রনিক অসুখগুলি। এরই মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চমকপ্রদ উন্নতির সুবাদে এইসব ক্রনিক অসুখ যেমন হৃদ্‌রোগ বা ডায়াবেটিসে মৃত্যুর হার কমতে থাকে। একটু পরিষ্কার করে নিই ব্যাপারটা, আমি কিন্তু বলতে চাইছি না যে হৃদ্‌রোগ বা ডায়াবেটিস কমে গেল বা সেরে গেল, আমার বক্তব্য হল, এইসব অসুখে মানুষের মারা যাওয়াটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল। মানুষের আয়ু হল আরও দীর্ঘায়িত।

স্বাভাবিকভাবেই, মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে সামনে এসে দাঁড়াল ক্যান্সার। হ্যাঁ, অধিকাংশ ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কাজেই, মানুষের গড় আয়ু বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সারের হার বৃদ্ধি নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়।

এখন ক্যান্সার হল এমন একটি অসুখ, যা দুরারোগ্য, যার চিকিৎসা জটিল, যার ভয়ংকর রূপের সঙ্গে সবাই পরিচিত, কাজেই এই রোগ হয়েছে জানতে পারলে মানুষ খরচ করতে পিছপা হয় না। স্বভাবতই, স্বাস্থ্য ব্যাবসায় জড়িত বহুজাতিক কোম্পানি, অর্থাৎ ওষুধপ্রস্তুতকারক কোম্পানি বা যন্ত্রাংশ প্রস্তুতের কোম্পানি, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যান্সার গবেষণায়। আর, সেই ব্যাবসার পালে হাওয়া দিতে দোসর হল সরকার।

ক্যান্সার-চিকিৎসা-ব্যাবসায় সরকার-বহুজাতিক যুগলবন্দির শুরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই। ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন শুরু

করলেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা ওয়ার অন ক্যান্সার। পৃথিবী থেকে ক্যান্সারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, লক্ষ্য এইটাই। রোগ প্রতিরোধে জোর নয়, শুধুমাত্র চিকিৎসা করেই ক্যান্সার হবে নির্মূল। সরল প্রশ্ন করাই যেত, একটি অসুখ হওয়ার পথ যদি বন্ধ না হয়, তাহলে হাজার উন্নত চিকিৎসা থাকলেও রোগ নির্মূল হবে কী করে! কিন্তু, এই সহজ প্রশ্ন কারও মাথায় এল না, বা বলা ভালো, মাথায় এলেও কেউ করলেন না, নাকি করা সত্ত্বেও কেউ কানে তুললেন না।

হালের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (ওয়ার অন টেরর) আর ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (ওয়ার অন ক্যান্সার) মধ্যে মিল অনেক। দুইক্ষেত্রেই, উৎসমুখ বন্ধ না করে সমাধানের পথ খোঁজা। ফল হাতের সামনেই।

কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার ব্যয়ের পরেও ক্যান্সার নির্মূল হওয়া তো দূর, ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর হারও কমানো গেল না তেমনভাবে। হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন স্যামুয়েল এপস্টেইন। ১৯৭৮ সালে তাঁর *দ্য পলিটিক্স অফ ক্যান্সার* বইয়ে তিনি তথ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাস্তব চিত্রখানি। দেখিয়ে দিলেন, শুধু চিকিৎসার উন্নতি দিয়ে ক্যান্সারের মতো একটি অসুখের নির্মূল তো দূর, নিয়ন্ত্রণই সম্ভব হতে পারে না। আরেকদিকে জানালেন, সামান্য কিছু সরকারি পদক্ষেপেই ক্যান্সার প্রতিরোধে নাটকীয় সুফল পাওয়া যেতে পারে। তিনি বইতে রাখঢাক না করেই বললেন, ক্যান্সারের কারণ, গতিপ্রকৃতি নিয়ে কিছুটা জানা গিয়েছে, অনেকটাই অজানা। কিন্তু, একথা নিশ্চিত যে, ক্যান্সারের প্রতিরোধ অনেকটাই, বা বলা ভালো, পুরোটাই, সরকারি সদিচ্ছের উপরে নির্ভরশীল।

কিন্তু, ওই যে, সদিচ্ছে, এই ব্যাপারটারই সরকারি তরফে বড্ড অভাব। বিশেষ করে, সদিচ্ছে দেখালে যদি আর্থিক ক্ষতির শিকার হয় বড়ো কর্পোরেট। নিত্যনতুন দামি চিকিৎসার লাভের সুফল পান বৃহৎ ওষুধ কোম্পানি, বড়ো যন্ত্রাংশের প্রস্তুতকারকেরা। আবার, ক্যান্সার প্রতিরোধে, রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আনতে গেলে, আর্থিক ক্ষতি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির মাথাদের। কাজেই, যুদ্ধ বজায় রইল। প্রতিরোধের কথা ভাবা হল না।

সব দেখেশুনে ডেনিস বারকিট হতাশ হয়ে বলেছিলেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ক্যান্সার গবেষণার হাল খারাপ কলমিস্তিরির মতো। বেসিন উপচে জল পড়ে পুরো বাথরুম ভেসে যাচ্ছে। আমরা গবেষণায় মত্ত যে কী করে কত দ্রুততার সঙ্গে সেই জল সরিয়ে বাথরুম শুকনো করে ফেলা যায়। কিন্তু, কারও মাথায়-ই আসছে না এই সরল সমাধান, যে কী করে কল থেকে জল পড়া বন্ধ করা যায়।

মোদ্দা কথা, অসুখের চিকিৎসা করা গেলে কোম্পানির হাতে দুটো পয়সা আসে। অসুখটা না হলে অর্থের সংস্থান হবে কোত্থেকে? এই জটিল সমস্যার সমাধান করে ফেলা গেল গত শতকের শেষ দিকে। কোম্পানিরা যখন দেখলেন যে, তাঁদের ব্যাবসা একটা স্থিতাবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে, তখন সুরাহা মিলল অভাবিত পথে। কেমন হয়, যদি আপাতসুস্থ মানুষকেও এনে ফেলা যায় ব্যাবসার আওতায়? কাজেই, অসুখ খোঁজা শুরু হল সুস্থ মানুষের মধ্যে। অস্ত্র হেলথ চেকআপ, স্ক্রিনিং।

আপনি ভেবে দেখুন, আপনার বাবা বা ঠাকুরদার সময়, সুস্থ মানুষ বলতে বোঝাতেন এমন একজনকে যাকে কিনা পারতপক্ষে ডাক্তারের সামনাসামনি যেতে হত না। আর এখন, সুস্থ মানুষ মানে এমন একজন, যিনি নিয়মিত হেলথ চেকআপের মধ্যে থাকেন, বছরে একবার অন্তত নিয়ম করে প্রচুর পরীক্ষানিরীক্ষা করান, আর নিয়ম করে ওষুধ খান। অর্থাৎ, আপাতসুস্থ মানুষও নিয়মিতভাবেই, বহুজাতিকের মুনাফা বাড়াতে পারছেন।

এই সুস্থ মানুষের মধ্যে রোগ খোঁজার ঢেউ এসে পড়ল ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও। বলা হতে লাগল, রোগ প্রতিরোধের মূল কথাটি লুকিয়ে আছে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগনির্ধারণের মধ্যেই। অর্থাৎ, সেই একই, নিয়মিত চেকআপ আর পরীক্ষানিরীক্ষা। এবং খেয়াল করুন, এই পরীক্ষানিরীক্ষার আওতায় আনা হয়ে গেল শুধু বাড়তি ঝুঁকি আছে এমন কয়েকজনকে নয়, আনা হল সব মানুষকেই।

শুরু থেকে না হলেও আমাদের দেশও হাঁটতে শুরু করেছে এই পথেই। শুনলে আশ্চর্য লাগতে পারে, এ দেশে একটি ন্যাশনাল ক্যান্সার কন্ট্রোল প্রোগ্রাম আছে সেই ১৯৭৫-১৯৭৬ সাল থেকেই। শুরুতে এবং পরবর্তী দশকের মধ্যভাগে, ভাবা হয়েছিল, গুরত্ব দেওয়া হবে মূলত

সচেতনতা বাড়ানোর বিষয়টি রয়ে গেল অনেকটাই খাতায়-কলমে। পাশাপাশি, ক্যান্সার প্রতিরোধে সরকারি স্তরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, সেগুলি নেওয়া হল না।

রোগপ্রতিরোধে—স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ানো এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগনির্ণয়ে। সময়ের আন্দাজে, সেই সিদ্ধান্ত ছিল যথাযথ। অন্তত, এ দেশে এই ব্যাপারটা স্বীকার করা হয়েছিল যে, রোগপ্রতিরোধ আর প্রাথমিক পর্যায়ে রোগনির্ণয়, এই দুই পথেই এগোনো প্রয়োজন।

কিন্তু, পরবর্তীকালে, সচেতনতা বাড়ানোর বিষয়টি রয়ে গেল অনেকটাই খাতায়-কলমে। পাশাপাশি, ক্যান্সার প্রতিরোধে সরকারি স্তরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, সেগুলি নেওয়া হল না। স্বাভাবিকভাবেই, আমাদের দেশে ক্যান্সারের হার বা তদ্‌জনিত মৃত্যুর হার কমানো গেল না। সুতরাং, পুনর্মূষিক ভব।

ইতিমধ্যে, এ দেশেও খোলা বাজারের হাওয়া লেগেছে। সরকারি

নীতির উপর বহুজাতিক কর্পোরেটের প্রভাব প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। রোগপ্রতিরোধের বিষয়টি চলে গেল পিছনের সারিতে। ২০০৫ সাল থেকে শুরু হল নতুন করে আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্র— যেখানে চিকিৎসাই মুখ্য, ক্যান্সার নিবারণের ব্যবস্থা নামে মাত্র— হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজগুলিতে জোর দেওয়া হল অঙ্কোলজি উইং তৈরিতে। এখনও পর্যন্ত এরকমটাই চলছে।

প্রাথমিক রোগপ্রতিরোধের কথা যেটুকু বলা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেইখানেও দায়িত্ব ছাড়া হল ব্যক্তি নাগরিকের উপর। অর্থাৎ, সরকার তামাকজাত পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ করবেন না, কিন্তু, ব্যক্তি নাগরিককে সর্বদাই সচেতন করবেন তাঁর ক্ষতি নিয়ে। টাটকা আর রাসায়নিকমুক্ত খাবার খেতে নাগরিকদের বলবেন প্রতিনিয়ত, কিন্তু, খাদ্যে ঢালাও রাসায়নিকের ব্যবহারে লাগাম টানতে কোনো উদ্যোগই নেবেন না সরকার।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন। ভাবছেন, এ তো ধান ভানতে শিবের গীত। মোদ্দা কথাটা কী? টেক হোম মেসেজ বলে তো একটা ব্যাপার আছে! এত কথার শেষে জানতে পারলাম কী?

হ্যাঁ, বিরক্ত বা অধৈর্য হওয়ার অধিকার আপনার আছে বই কী। আপনি স্বাস্থ্যবিষয়ক ম্যাগাজিন পড়েন, সন্ধ্যেবেলায় টিভি খুলে শোনেন ডাক্তারবাবুদের সতর্কবার্তা। আপনারা ধূমপান থেকে দূরে থাকেন, মদ্যপান মাঝেমধ্যে করে ফেলে মনস্তাপে ভোগেন, প্রাণপণে সবুজ শাকসবজি খান, পাঁঠার মাংস প্রতি রোববারের জায়গায় মাসে একবারে নামিয়েছেন, ভাগাড়কাণ্ডের শেষে নিজেকে বুঝিয়েই ফেলেছেন যে নিরামিষ আহারই মনুষ্যজীবনের অভীষ্ট। অনেকে তো চা ছেড়ে গ্রিন টি ধরেছেন। তা সত্ত্বেও, অনেকেই ক্যান্সার এড়াতে পারেন না। তখন, কিছুটা আফশোস, আরও আগে সচেতন হলে ভালো হত, অথবা ভাগ্যকে দোষেন। যাঁরা আরেকটু খবর রাখেন, তাঁরা সান্ত্বনা খোঁজেন জিনের ত্রুটিতে।

ক্যান্সারের প্রতিরোধ বা নিবারণ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া হবার নয়। কথাটা আজকের নয়, প্রায় চার দশক আগেকার।

আমার বক্তব্য খুব জটিল কিছু নয়। অনেক স্বাস্থ্যসচেতনতা, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ইত্যাদির শেষে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, ক্যান্সারের ঝুঁকি লক্ষণীয়ভাবে কমে না। ক্যান্সারের প্রতিরোধ বা নিবারণ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া হবার নয়। কথাটা আজকের নয়, প্রায় চার দশক আগেকার। আমাদের দুর্ভাগ্য, সরকারের কানে জল ঢোকেনি। আমরা ব্যক্তিস্বার্থরক্ষায় যতখানি আকুল, সমষ্টির স্বার্থরক্ষায় ততখানি নই।

মনে রাখুন, সরকারি মতে, আমাদের দেশে ক্যান্সারে ভুগছেন কমবেশি পঁচিশলাখ মানুষ; প্রতিবছর নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছেন আট-নয় লাখ, মারা যাচ্ছেন প্রায় লাখচারেক। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা সংস্থা গ্লোবোক্যানের তথ্য অনুসারে, এ দেশে প্রতিবছর ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে বারো লাখ, মারা যাচ্ছেন প্রায় সাত লক্ষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, আমাদের দেশে ক্যান্সারের হার বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। তাঁদের আশঙ্কা, দু-হাজার তিরিশ সাল নাগাদ, শুধুমাত্র ভারতেই, প্রতিবছর, এককোটির বেশি মানুষ মারা যাবেন ক্যান্সারে। পরিবারপিছু ন্যূনতম একজন ক্যান্সারআক্রান্ত, সেই দুর্দিনও আর বেশি দূরে নয়। কাজেই, ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে আমরা এগিয়েছি, বা এগোচ্ছি, এমন ভাবার সুযোগ নেই।

ক্যান্সারের প্রাথমিক প্রতিরোধ—অর্থাৎ, কারণগুলি খুঁজে ক্যান্সারের হার কমানো—এছাড়া সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগনির্ণয় করে মৃত্যুর হারে কিছুটা স্থিতিশীলতা হয়তো আনা সম্ভব, কমানো সম্ভব চিকিৎসার ব্যয়ভার ও জটিলতা— বর্তমান পরিস্থিতিতে তার গুরুত্বও কিছু কম নয়—কিন্তু, ক্যান্সার প্রতিরোধই একমাত্র দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। জাতীয় স্তরে সরকারি উদ্যোগ ছাড়া ক্যান্সার প্রতিরোধে সাফল্য বিশ্বের অন্য কোনো দেশে আসেনি— আমাদের দেশে আসবে, সে সম্ভাবনা কম।

আমার কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আপনি স্বাস্থ্যসচেতন হবেন না। ব্যক্তিজীবনে আতঙ্কিত না হয়েও সচেতন থাকুন। ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো তো জানেনই। অনেকদিন ধরে কাশি বা গলা ভাঙা থাকলে, শরীরের কোনো অংশে হঠাৎ কোনো ডেলা বা ফোলা দেখলে, দীর্ঘদিনের তিল বা জড়ুলের রং পরিবর্তিত হলে, পায়খানার অভ্যাসে আচমকা বদল হলে ডাক্তারের কাছে আসুন, তাঁর পরামর্শের উপর ভরসা রেখে পরীক্ষানিরীক্ষা করান। নেশা থেকে দূরে থাকুন। টাটকা সবজি, ফল খান, মরসুমি সবজি বা ফল মরসুমেই খান। দূরদেশ থেকে চালান হয়ে আসা ফলের নাম শুনতে দারুণ হলেও, বাড়ির পাশের ফল খান। কিউই ফ্রুটের চাইতে পেয়ারা কিন্তু আপনার পক্ষে ভালো, কেননা উৎপাদন হয়েছে পাশেই, আর সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়েনি। গুগলে লেখাপড়া করুন অবশ্যই। কিন্তু, মনে রাখবেন, অধিকাংশ তথ্যই অন্যান্য দেশের থেকে আসা। একজন আফ্রিকার মানুষের চুলের সমস্যার সঙ্গে আপনার চুল পড়ে যাওয়ার যেমনি অনেক ফারাক, স্বাস্থ্যের বাকি বিষয়গুলোও কিন্তু তাই। সেইজন্যেই, সচেতন হন, সঠিক অর্থে সচেতন হন।

সমস্যা হল, আমরা সচেতনতা বিষয়েও সচেতন নই। হেঁয়ালি মনে হল? আমরা সচেতনতার সঠিক অর্থ বুঝিনি। আমাদের কাছে

স্বাস্থ্যসচেতনতা হল এক চুষিকাঠি, যা দিয়ে বহুজাতিক সংস্থা, স্বাস্থ্যব্যবসায়ী, সরকার আমাদের বিভ্রান্ত করছে। সুস্থ বলতে বুঝতে শিখেছি নিয়মিত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া, টেস্ট করানো। আমরা ক্যান্সার সচেতনতা বলতেই বুঝতে শিখেছি বিধিনিষেধ, ব্যক্তিজীবনে কিছু পরিবর্তন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা নিজেদের নির্বিষ উন্নততর প্রাণীতে বদলে ফেললেও জাতীয় স্তরে ক্যান্সার, উল্লেখযোগ্য হারে, কমবে না, যতক্ষণ না আমরা সমষ্টিগতভাবে সচেতন হচ্ছি, সরকার

বহুজাতিক লোভে খাবারে, জলে, বাতাসে বিষ—ভুগব আমি, আপনি—সরকার টিভিতে বিজ্ঞাপন দেবেন আমাকে-আপনাকেই সচেতন হওয়ার উপদেশসহযোগে, এমনকী অসুখ হলে দোষও চাপাবেন ব্যক্তিনাগরিকের ঘাড়েই।

বহুজাতিক সংস্থা বা বড়ো ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের দিকে ফিরে তাকাবেন না। উদার অর্থনীতির মজাই এই, লাভের গুড় খাবেন কর্পোরেট বহুজাতিক, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দায় সরকার চাপাবেন ব্যক্তি নাগরিকের ঘাড়ে। কাজেই, বহুজাতিক লোভে খাবারে, জলে, বাতাসে বিষ—ভুগব আমি, আপনি—সরকার টিভিতে বিজ্ঞাপন দেবেন আমাকে-আপনাকেই সচেতন হওয়ার উপদেশসহযোগে, এমনকী অসুখ হলে দোষও চাপাবেন ব্যক্তিনাগরিকের ঘাড়েই। আমি-আপনি, সাধারণ নাগরিক সচেতন হয়ে পথে না নামলে পরিস্থিতির বদল হবে না।

কাজেই, সচেতন হন। স্বাস্থ্যের দাবিতে সোচ্চার হন। সরকারকে বাধ্য করুন আসল সমস্যার বিষয়ে নজর ফেরাতে। খাদ্যে রাসায়নিক সার-কীটনাশক-কৃত্রিম রঙের ব্যবহার হোক নিয়ন্ত্রিত; জেনেটিক্যালি মডিফায়েড বীজ বা খাবার হোক নিষিদ্ধ; উন্নয়নের সিমেন্টের গুঁড়োয় সর্বক্ষণ যাতে শ্বাস নিতে না হয় আপনাকে-আমাকে; কলকারখানা-গাড়ির ধোঁয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দেশের আইন হোক উন্নত দেশের মতো কঠোর; পানীয় জল হোক রাসায়নিকমুক্ত। চুপ থাকবেন না। কথাটা বলুন। আপনি-আমি সবাই মিলে দাবি না তুললে এরকমটাই চলতে থাকবে।

চলুন, সবাই মিলে একজোট হই। একসঙ্গে গলা তুলি। একমাত্র তাহলেই, সমাজের সবার সঙ্গে একসাথে কমবে আপনারও ক্যান্সারের ঝুঁকি। সেইটাই সঠিক স্বাস্থ্যসচেতনতা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. বিষাণ বসু, এমবিবিএস, এমডি, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে সহযোগী অধ্যাপক।

টুকরোখবর

ক্যান্সার চিকিৎসার নতুন ব্যবস্থা প্রোটন থেরাপি

ভারত সরকারের আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক অধিকরণ চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালকে একটি নতুন যন্ত্র বসানোর অনুমতি দিয়েছে। যন্ত্রটির নাম প্রোটিয়াস ২৩৫, প্রোটন কণা দিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসার এই যন্ত্র ভারত, এমনকী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও এই প্রথম। সারা পৃথিবীতে এমন মাত্র ৭৮টি যন্ত্র আছে।

ভারতে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক বোর্ডের লাইসেন্স পাওয়া প্রায় ১০০০ রেডিয়োথেরাপি যন্ত্র আছে ৪৭৫টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে। যন্ত্রগুলি হয় গামা রশ্মি নির্ভর টেলিকোবাল্ট ইউনিট অথবা এক্স-রে নির্ভর লিনিয়ার অ্যাক্সিলেটর।

ডিজাইন, লে আউট, নির্মাণ এবং মেশিনটি বসানোর প্রতিটি ধাপেই বোর্ডের অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

প্রোটন থেরাপির যন্ত্রটি অন্যরকম। এটি ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করতে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ধনাত্মক আধানের প্রোটন কণার রশ্মি ব্যবহার করে। শিশুদের ক্যান্সার ও শরীরের গভীরে থাকা ক্যান্সারের চিকিৎসায় এই পদ্ধতি গামা রশ্মি বা এক্স-রে-র তুলনায় বেশি কার্যকর।

জানা গেছে যন্ত্রটির জন্য খরচ পড়েছে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

মুখের ভেতরের ক্যান্সার

ডা. কুশল সেন

আমাদের শরীর অসংখ্য কোশ দিয়ে তৈরি। কোশগুলি একত্রিত হয়ে কলা তৈরি করে, আর কলার বিভিন্ন সমন্বয়ে আমাদের শরীরের অঙ্গগুলি তৈরি হয়।

কোশগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তারা নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। এবং একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বিভাজনের পর তাদের মৃত্যু হয় স্বাভাবিক নিয়মে। যখন কোনো কারণে এই বিভাজনের হার অস্বাভাবিক রকমের বৃদ্ধি পায় অথবা স্বাভাবিক নিয়মে কোশের মৃত্যু হয় না, সেই অবস্থায় শরীরের ওই অংশে কোশের ডেলা বা টিউমার তৈরি হয়। শরীরের কোনো অংশে কোশ বা কলার অস্বাভাবিক অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি পাওয়ার এই অবস্থাকে ক্যান্সার বা কর্কট রোগ বলে। মনে রাখতে হবে, যদি কেবলমাত্র কোশের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, তবে তাকে ক্যান্সার বলা হয় না। কোশগুলো অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে হবে, এবং সাধারণভাবে ক্যান্সার কোশকে আমাদের দেহের প্রহরী-ব্যবস্থা মারতে পারবে না; তারা প্রায় 'অমর'।

আমাদের দেহের নানা কোশ নানাভাবে সংখ্যায় বাড়ে। সবথেকে সাধারণ উদাহরণ হল, রক্তের লাল কোশ। এই কোশের এক-একটার গড় পরমায়ু মাত্র ৭২ দিন। কিন্তু হাড়ের মজ্জার ভেতরে-থাকা একরকম কোশ সংখ্যায় বেড়ে ও পরিবর্তিত হয়ে সবসময় রক্তের লাল কোশ তৈরি করছে বলে লাল কোশ কমে গিয়ে আমরা মরে যাই না। কিছু কোশ বেড়ে বেড়ে 'টিউমার' তৈরি করতে পারে—যেমন আমরা দেখি অনেকের গায়ে ঢিবির মতো টিউমার আছে। এরা খানিকটা বেড়ে আর বাড়ে না, তাই তারা নিরাপদ, তারা ক্যান্সার নয়।

মুখের ভেতরে বা মুখবিবরের ক্যান্সার

আমাদের মুখের ভিতরের বিভিন্ন অংশে (জিহ্বা, ঠোঁট, মাড়ী, তালু, গালের ভেতরের অংশ) যে কোশকলার আবরণ রয়েছে তার ক্যান্সারকে বলা হয় ওরাল ক্যান্সার বা মাউথ ক্যান্সার বা মুখবিবরের ক্যান্সার। এছাড়াও আমাদের মুখের ভিতরে থাকা বিভিন্ন লালা গ্রন্থি, টনসিল, গলবিল বা ফ্যারিংস (যেখানে শ্বাসনালী মুখগহ্বরের সাথে মেশে) ইত্যাদি জায়গার ক্যান্সারও এই তালিকায় পড়ে।

মুখের ক্যান্সারের কারণ

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার, মদ্যপান মুখের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ।

যাঁরা তামাক ও মদ অত্যধিকভাবে সেবন করেন, তাঁদের মুখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশেই বেশি থাকে।

খাবারের অভ্যাসের সাথেও মুখের ক্যান্সারের যোগ আছে। অপুষ্টিকর খাবার মুখের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা বাড়ায়। অন্যদিকে পুষ্টিকর, সুষম খাবার, খাবার তালিকায় শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদির উপস্থিতি মুখের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের সংক্রমণ মুখের ক্যান্সারের আরেকটি কারণ। এই ভাইরাস চামড়ায় আক্রমণ করে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ভিতরের আবরণের যে জায়গাগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ভিজে-ভিজে থাকে তার উপর আক্রমণ করে—যেমন যোনিদেশ, মলদ্বার, মুখের ভিতর ইত্যাদি। সাধারণত আক্রান্ত মানুষের সঙ্গে অন্য কারো চামড়ার সরাসরি ছোঁয়ার মাধ্যমে ভাইরাস একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়াতে পারে। এই ভাইরাসের সংক্রমণের সাথে মুখের ক্যান্সারের যোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে সুপুরি খাওয়ার এক চল আছে। এটাও মুখের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। সেই কারণে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলোতে মুখের ক্যান্সারের সংখ্যা বেশি।

মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ

- মুখের ভিতরের ঘা, যা দীর্ঘদিন ধরে সারছে না।
- মুখের ভিতরের কোনো ফোলা, যেটা অনেকদিন ধরে আছে এবং আকারে বাড়ছে।
- গলায় কোনো ফোলা, যেটা কমছে না।
- হঠাৎ করে কোনো নড়বড়ে দাঁত বা মাড়ীতে কোনো গর্ত, যেটা সারছে না।

➢ জিভে বা ঠোঁটে কোনোরকম ঝিনঝিনে অবশভাব বা অস্বাভাবিক অনুভূতি, যেটা যাচ্ছে না।

➢ হঠাৎ করে গলা ভেঙে যাওয়া বা মুখের ভিতরের অংশে লাল বা সাদা ছোপ ছোপ-এর আবির্ভাব।

➢ এছাড়াও খাবার গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা অনুভুত হওয়া ।

➢ সাধারণ সংক্রমণ ছাড়াও এগুলো ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে। ফলত যদি এগুলো হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। যাঁরা নিয়মিত ধূমপান করেন বা তামাকজাত দ্রব্য সেবন করেন, সুপুরি খাওয়ার অভ্যাস আছে যাঁদের, তাঁদের নিয়মিত দাঁতের ডাক্তার দেখানো উচিত, কারণ অনেক সময়ই ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো দাঁতের ডাক্তারবাবুই ধরে ফেলতে পারেন।

মুখের ক্যান্সারের ধরন

যে ধরনের কোশ থেকে ক্যান্সারের উৎপত্তি তার উপর ভিত্তি করে মুখের ক্যান্সারের প্রকারভেদ করা হয়।

ক. **স্কোয়ামাস কোশ কারসিনোমা:** স্কোয়ামাস কোশ শরীরের বিভিন্ন অংশে দেখা যায়, যেমন চামড়ায়, মুখের ভিতরে ইত্যাদি। প্রায় ৯০% মুখের ক্যান্সারই এই ধরনের হয়।

খ. **অ্যাডিনোকারসিনোমা:** মুখের লালাগ্রন্থি থেকে যে ক্যান্সারের উৎপত্তি হয়।

গ. **সারকোমা:** শরীরের সংযুক্ত কলা যেমন হাড়, মাংসপেশি ইত্যাদি থেকে যে ধরনের ক্যান্সার হয়।

ঘ. **ওরাল ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা:** মেলানোসাইট কোশ যা আমাদের শরীরের চামড়ার রঙের জন্য দায়ী 'মেলানিন' নামক রঞ্জন ক্ষরণ করে, তাদের ক্যান্সার। তারা মুখের ভিতরে গাঢ় রঙের ছোপ ছোপ ফোলা অংশ হিসাবে দেখা দেয়।

ঙ. **লিম্ফোমা:** এই ধরনের ক্যান্সারের উৎপত্তি হয় লসিকা গ্রন্থির কোশ থেকে। মুখের ভিতরেও এই ধরনের ক্যান্সার দেখা যেতে পারে।

কাদের হয় এই মুখের ক্যান্সার?

সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের এই রোগ হয়। ৫০-৭৪ বছর বয়সিদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। শতকরা মাত্র ১২.৫০ % ক্ষেত্রে ৫০ বছরের কম বয়সিদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়, আর তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সার হবার পেছনে অনেক সময়েই হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস সংক্রমণের ভূমিকা থাকে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে মুখবিবরের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেশি, কারণ ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় মদ্যপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বেশি করে।

মুখের ক্যান্সার ছড়ায় কীভাবে?

দু-ভাবে মুখের ক্যান্সার ছড়াতে পারে।

➢ সরাসরিভাবে: ক্যান্সার কোশ মুখের থেকে সরাসরিভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যেমন আশপাশের চামড়ায়, চোয়ালের পিছনে।

➢ লসিকাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে: লসিকা তন্ত্র তৈরি হয় লসিকা নালি ও লসিকা গ্রন্থি দিয়ে যারা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্য দিয়েও ক্যান্সার কোশ শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

যখন মুখের ক্যান্সার দূরে কোনো অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে মেটাস্ট্যাটিক ওরাল ক্যান্সার বলে। গলার লসিকাগ্রন্থিতে প্রথম মুখের ক্যান্সার ছড়ায়।

মুখের ক্যান্সার নির্ণয়

ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু করতে গেলে ক্যান্সারের রোগের উপস্থিতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া জরুরি। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার শরীরের উপর খারাপ প্রভাব পড়ে, তাই শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করা যায় না।

যদি আপনার মুখের ক্যান্সার হয়েছে বলে মনে হয় বা উপরিল্লিখিত লক্ষণগুলো আপনার শরীরে দেখা দেয় তবে আপনাকে শীঘ্র নিকটবর্তী ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে দাঁতের বা নাক-কান-গলার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তাঁরা নিম্নলিখিত পরীক্ষানিরীক্ষাগুলো করে রোগ নির্ণয় করবেন।

বায়োপ্সি: অস্বাভাবিক কোশ-কলার খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় কোশ-কলার বিন্যাস দেখাকে বায়োপ্সি বা টিসু বায়োপ্সি বলে। এই পরীক্ষা করে ক্যান্সার রোগের উপস্থিতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় এবং রোগের ধরন জানা যায়।

এফএনএসি (ফাইন নিডল অ্যাসপিরেশন অ্যান্ড সাইটোলজি): এই পরীক্ষায় টিউমার থেকে সূঁচের মাধ্যমে রস নিয়ে তাতে ক্যান্সার কোশের উপস্থিতি দেখা হয়। বায়োপ্সির মতো না হলেও রোগ নির্ণয়ে এই পরীক্ষার ভূমিকাও অপরিসীম।

এই দু-টি পরীক্ষার অন্তত একটি ছাড়া ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা শুরু করা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে।

এছাড়াও রোগ অন্য কোথাও ছড়িয়েছে কিনা জানার জন্য এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআইস্ক্যান, আল্ট্রাসাউন্ড ইত্যাদি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

রোগের স্টেজিং ও গ্রেডিং

স্টেজিং দিয়ে বোঝা যায় রোগটা কী অবস্থায় আছে বা কতটা ছড়িয়েছে। সাধারণত টিএনএম (TNM) স্টেজিং ব্যবহৃত হয়। টি (T) দিয়ে বোঝায় টিউমার-এর আকার, আয়তন কতটা। কতগুলো লসিকা গ্রন্থিতে রোগ ছড়িয়েছে তার উপর দাঁড়িয়ে হয় এন (N) স্টেজিং আর রোগটা দূরের কোনো অঙ্গে ছড়িয়েছে কিনা সেটার জন্য আছে এম (M) স্টেজিং।

গ্রেডিং দিয়ে বোঝা যায় রোগটা কতটা মারাত্মক এবং ভবিষ্যতে রোগটার ছড়ানোর সম্ভাবনা কত।

লো গ্রেড—ছড়ানোর সম্ভাবনা কম।

মডারেট গ্রেড—ছড়ানোর সম্ভাবনা মাঝামাঝি।

হাই গ্রেড—এরা সব থেকে বেশি ছড়ায়।

স্টেজিং আর গ্রেডিং থেকে বোঝা যায় যে রোগটা কীরকম আর রোগের চিকিৎসার পূর্বপরিকল্পনা (Treatment Plan) করতে এই গ্রেডিং-এর ভূমিকা আছে।

আরলি মাউথ ক্যান্সার: ছোট্ট অপারেশনের দ্বারাই রোগ নির্মূল করে ফেলা যায়।

ইন্টারমিডিয়েট মাউথ ক্যান্সার: রোগ নির্মূল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, বড়ো অপারেশন ছাড়া রোগ সারানো সম্ভব হয় না।

অ্যাডভান্সড মাউথ ক্যানসার: রোগটা ছড়িয়ে গেছে, সারার সম্ভাবনা খুবই কম। অপারেশন, রেডিয়েশন (রে দিয়ে চিকিৎসা), কেমোথেরাপি এগুলো সবগুলোরই একসাথে প্রয়োজন হয় চিকিৎসার জন্য।

চিকিৎসা

মুখের ক্যান্সার যদি আগেভাগে বা প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে তবে তা ছোটো অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই সম্পূর্ণরূপে এমনভাবে নির্মূল করা সম্ভব যাতে আর রোগটা কখনোই ফিরে না আসে। তাই ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা দিলেই বা মুখের ভিতর অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে বলে মনে হলেই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এমনকী একদম শেষ পর্যায়ের (অ্যাডভান্সড স্টেজ) ক্যান্সারও সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা ৫০:৫০। তবে সার্জারি, ওষুধ আর রে দিয়ে চিকিৎসা অন্তত চারমাস ধরে চালাতে হবে।

ক্যান্সারের চিকিৎসা কোনো একটা বিভাগের চিকিৎসা নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভাগগুলির পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে এই রোগের মোকাবিলা করতে হবে। যেমন মুখের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং সার্জন-এর পাশাপাশি দাঁতের ডাক্তার, মানসিক রোগের ডাক্তার, নাক-কান-গলার ডাক্তার এদের সাহায্য নিতে হবে। খেতে অসুবিধা থাকলে বিশেষ নল নাক দিয়ে পরিয়ে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তা না করা সম্ভব হয় তবে বিকল্প খাবারের রাস্তা গ্যাস্ট্রোস্টমি-এর (যেখানে পাকস্থলি ফুটো করে নল বসানো থাকে, যার ভিতর দিয়ে তরল খাবার সরাসরি পাকস্থলিতে পাঠানো যায়) ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগের চিকিৎসা শুরু করার আগে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো দেখে নিয়ে কী চিকিৎসা হবে তা ঠিক করা হবে।

ক. রোগের স্টেজ ও গ্রেড

খ. রোগটা কতটা ছড়িয়েছে

গ. রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য

ক্যান্সার যদি গলার বাইরে না ছড়িয়ে থাকে তাহলে কেবল অপারেশনের মাধ্যমেই রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব।

কিন্তু রোগ যদি অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে তবে অপারেশন, রে দিয়ে চিকিৎসা আর কেমোথেরাপি, তিনটেই প্রয়োজন।

সার্জারি আর রে দিয়ে চিকিৎসা হল লোকাল ট্রিটমেন্ট, সার্জারি করে যেখানে টিউমার সেখানকার ক্যান্সার কোশগুলোকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। 'রে' দিয়ে আক্রান্ত কোশগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। আর কেমোথেরাপির মূল কাজ হচ্ছে সিস্টেমিক থেরাপি। অর্থাৎ শরীরের দূরে যেখানে ক্যান্সার ছড়িয়েছে সেগুলোকে মারা।

এছাড়া একসাথে রে ও কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। সেখানে কেমো ওষুধের কাজ হল ক্যান্সার কোশকে আরও 'রে সেন্সিটিভ' করে তোলা, যাতে রে দিয়ে সহজে বেশি ক্যান্সার কোশ মারা পড়ে।

মুখের ক্যান্সারের প্রাথমিক অথবা মাঝারি স্তরে সার্জারি ও তার পরে রে দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এবং অ্যাডভান্সড স্টেজে প্রথমে কেমো ওষুধ দিয়ে টিউমারের আকার ছোটো করে নিয়ে তারপরে সার্জারি করা হয় এবং রে দেওয়া হয়। আর তারপরেও সার্জারি করা না গেলে শুধু রে দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার দু-ধরনের লক্ষ্য থাকে—

ক. রোগ নির্মূল: (Curative) প্রাথমিক বা মাঝারি অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে এই উদ্দেশ্য নিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়।

খ. রোগকে আটকে রাখা বা রোগের লক্ষণকে কমানো (Palliative): রোগ যদি শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে থাকে তবে রোগকে আর সম্পূর্ণরূপে সারানো যায় না। তখন চিকিৎসার উদ্দেশ্য থাকে রোগকে আটকে রাখা এবং রোগীর কষ্ট কমিয়ে রাখা।

ক্যান্সার এমন একটা রোগ যা প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল সম্ভব, কিন্তু ক্যান্সার নিয়ে কুসংস্কার ও ভুল ধারণা সাধারণ মানুষ এমনকী চিকিৎসকদের মধ্যেও প্রবল। ফলত ক্যান্সার রোগের নির্মূল করাতে আয়ুর্বেদিক, হোমিয়োপ্যাথি বা জড়িবুটির রাস্তায় হেঁটে অনেকেই রোগটাকে বাড়িয়ে তোলেন, তখন আর রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয় না। তাই ক্যান্সার নিয়ে জনমানসে এবং ডাক্তারদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. কুশল সেন, এমবিবিএস, এখন ক্যান্সার (রেডিয়োথেরাপি) বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিচ্ছেন।

বিনাইন প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট (Benign Prostate Enlargement)

ডা. মৃন্ময়

পুরুষদের মূত্রথলির নীচে উলটানো শঙ্কু আকৃতির একটি গ্রন্থি থাকে যার নাম প্রস্টেট। এটি যৌনকার্যের সহায়ক অঙ্গ। সাধারণত ৪৫ থেকে ৫০ বছরের পর থেকে অনেকের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থি আকৃতিতে স্বাভাবিকের থেকে বাড়ে যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বিনাইন প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট বা বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া (BPH) বলা হয়। আকৃতিতে বেড়ে যাওয়ার কথা শুনে ভুলেও একে ক্যান্সার-এর সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না। এটি কোনো ক্যান্সার নয়। তবে হ্যাঁ প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার হয়, কিন্তু তা অন্য জিনিস। মূত্রনালি মূত্রথলি থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রস্টেট গ্রন্থির ভেতর দিয়ে গিয়ে পুরুষাঙ্গে প্রবেশ করে। তাই প্রস্টেট গ্রন্থি আকারে বাড়লে তা মূত্রনালিতে চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলস্বরূপ পেচ্ছাপ করার ক্ষেত্রে অসুবিধের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রস্টেট গ্রন্থি মূত্রথলির মুখের কাছেও বাধার সৃষ্টি করে। সাধারণত ৪৫ থেকে ৫০ বছরের পর পুরুষেরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও, অনেক সময় ৪০ বছর বা তার আগেও অনেকে এর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

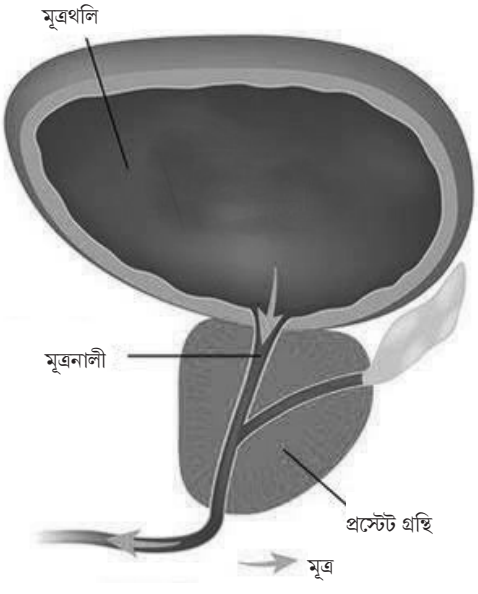

চিত্র ১. স্বাভাবিক অবস্থায় প্রস্টেট গ্রন্থির অবস্থান

কী কী উপসর্গ হতে পারে ?

এর দরুন স্বাভাবিক পেচ্ছাপের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। একটি জলের পাইপের ওপর পা দিয়ে ভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে পাইপের মুখ দিয়ে জল পড়ার যা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, উপসর্গগুলো অনেকটা ওইরকম।

চিত্র ২. BPH-এর উপসর্গ

- পেচ্ছাপ শুরু করতে অসুবিধে হওয়া।
- ঘন ঘন পেচ্ছাপ পাওয়া ।
- পুরো পেচ্ছাপ করতে অসুবিধে হওয়া।
- স্বাভাবিকের থেকে জোর চাপ দিয়ে পেচ্ছাপ করার প্রয়োজন হওয়া।
- পেচ্ছাপের গতি আগের থেকে কমে যাওয়া।
- থেমে থেমে পেচ্ছাপ হওয়া।
- ঘন ঘন বা হঠাৎ করে পেচ্ছাপ পাওয়া।
- রাত্রে বার বার পেচ্ছাপ করতে ওঠা।

- পেচ্ছাপ ধরে রাখতে না পারা ও কাপড়ে হয়ে যাওয়া।
- পেচ্ছাপের সাথে রক্ত মিশে বেরোতে পারে।

কী কারণে বয়সকালে প্রস্টেট আকারে বাড়ে?

ঠিক কী কারণে বয়সকালে (বিশেষ করে ৪৫ থেকে ৫০-এর পর) প্রস্টেট গ্রন্থি আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায় তা অজানা। কিন্তু মনে করা হয় ৫০ পরবর্তীকালে পুরুষদের শরীরে হরমোনের তারতম্য ঘটে যার ফলে প্রস্টেট গ্রন্থি আকারে বৃদ্ধি পায়।

বিনাইন প্রস্টেটিক এনলার্জমেন্ট থেকে কি প্রস্টেট ক্যান্সার হয়?

অনেকেই ভাবেন বয়সকালে প্রস্টেট গ্রন্থির আকারে বেড়ে যাওয়া থেকে প্রস্টেট ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু প্রস্টেট ক্যান্সারের সাথে বিনাইন প্রস্টেটিক এনলার্জমেন্ট-এর কোনো সম্পর্ক নেই। প্রস্টেট ক্যান্সারের প্রবণতা বিনাইন প্রস্টেটিক এনলার্জমেন্ট-এর রোগীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আকৃতির প্রস্টেটের চেয়ে বেশি—এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

এই রোগের প্রভাব ব্যক্তি ও রোগের পর্যায় সাপেক্ষে ভিন্ন হয়। বেশিরভাগের ক্ষেত্রে এর অল্পবিস্তর উপসর্গ দেখা দেয় যা দৈনন্দিন জীবনযাপনে তেমন কোনো প্রভাব ফেলে না। এক্ষেত্রে চিকিৎসা

কয়েকটি অবস্থায় অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে—হঠাৎ করে পেচ্ছাপ আটকে গেলে, পেচ্ছাপের সাথে রক্ত মিশে বেরোলে, পেচ্ছাপের সঙ্গে জ্বালা বা জ্বর থাকলে, কিডনির রোগ থাকলে।

করানোর প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু উপসর্গ বাড়লে বা দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রভাব ফেললে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কারণ অনেকদিন অবহেলা করলে এর থেকে কিডনির ক্ষতিও হতে পারে। তাছাড়া অনেকের ক্ষেত্রে কোনো উপসর্গ ছাড়াই হঠাৎ করে পেচ্ছাপ আটকে যাওয়ার মাধ্যমে এর প্রথম প্রকাশ ঘটতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা পেচ্ছাপের সংক্রমণে বেশি ভোগেন। তবে কয়েকটি অবস্থায় অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে—

- হঠাৎ করে পেচ্ছাপ আটকে গেলে।
- পেচ্ছাপের সাথে রক্ত মিশে বেরোলে।
- পেচ্ছাপের সঙ্গে জ্বালা বা জ্বর থাকলে।
- কিডনির রোগ থাকলে।

কী কী পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হতে পারে?

➦ ডাক্তারবাবু আপনার রোগ ও তার উপসর্গ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে চাইতে পারেন। আপনি সারাদিনে কতটা জল বা জল জাতীয়

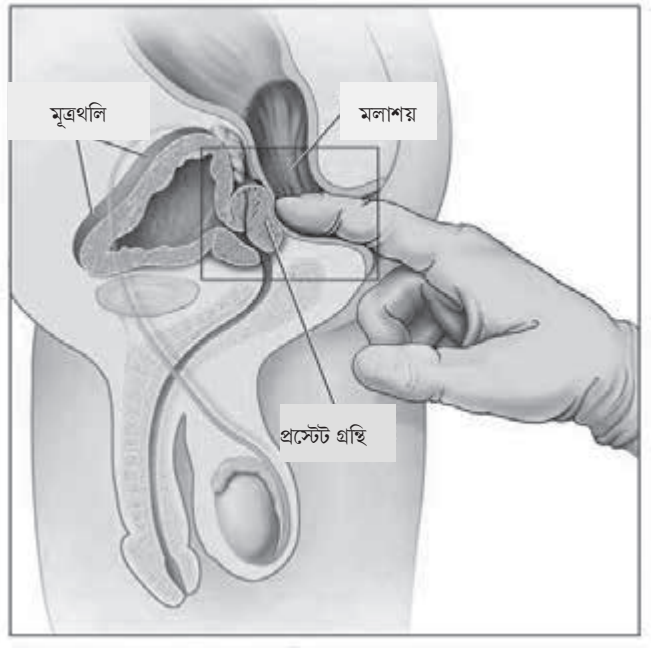

চিত্র ৩. মলদ্বারে আঙুল ঢুকিয়ে প্রস্টেট গ্রন্থির পরীক্ষা

পানীয় পান করেন, কতবার পেচ্ছাপ করেন, কতটা পরিমাণে পেচ্ছাপ করেন তা সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন। তাই সম্ভব হলে শেষ ৭ দিনের এই তথ্যগুলি কাগজে নথিভুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে যান ও ডাক্তার দেখানোর সময় তা বলুন।

➦ ডাক্তারবাবু আপনার পেট ও যৌনাঙ্গ হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

➦ মলদ্বারে আঙুল ঢুকিয়ে প্রস্টেট গ্রন্থির আকৃতি ও গঠন পরীক্ষা করতে পারেন।

➦ রক্তের সাধারণ পরীক্ষা, কিডনির জন্য রক্ত পরীক্ষা বা প্রস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (PSA)-এর পরীক্ষা করতে বলতে পারেন।

➦ পেচ্ছাপের সাধারণ ও কালচার পরীক্ষা ।

➦ তলপেটের ও কিডনির ইউ এস জি।

➦ পেচ্ছাপের গতি ও চাপ মাপার জন্য ইউরোফ্লোমেট্রি বা প্রেশার-ফ্লো ইউরোডায়ানামিক স্টাডি করাতে হতে পারে।

➦ বিশেষ ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান বা সিস্টো-ইউরেথ্রোস্কোপি (ক্যামেরা লাগানো বিশেষ যন্ত্র দিয়ে মূত্রনালি ও মূত্রথলির ভেতর পরীক্ষা করা) করানোর প্রয়োজন হতে পারে।

কী চিকিৎসা করতে হতে পারে?

এই রোগের চিকিৎসা ব্যক্তি এবং রোগের অবস্থা ও উপসর্গের গভীরতার ওপর নির্ভর করে। অনেকসময় জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তনেই কাজ চলে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সাথে ওষুধও লাগে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে অপারেশনেরও দরকার পড়ে। কী চিকিৎসা লাগবে ও তার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে ডাক্তারবাবুর সাথে আলোচনা করুন।

জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ তা হল—

- মদ পান করা বন্ধ করুন।
- কফি ও কোলা জাতীয় খাবার যতটা কম খাওয়া যায় ততটাই শ্রেয়।
- খাবারে কৃত্রিম মিষ্টিদ্রব্যের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
- সন্ধ্যের পর জল পান কমান। সম্ভব হলে ঘুমাতে যাওয়ার ২ ঘণ্টা আগে থেকে জল পান বন্ধ রাখুন। কিন্তু অবশ্যই লক্ষ রাখবেন যাতে দিনের বেলায় যথাযথ পরিমাণে জল পান করা হয়। নয়তো লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি ।
- বাইরে বেরোনোর আগে পেচ্ছাপ করুন (পেচ্ছাপ না পেলেও)।
- একবার পেচ্ছাপ করার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আর একবার পেচ্ছাপ করার চেষ্টা করুন। এতে করে পেচ্ছাপের থলিতে জমে থাকা পেচ্ছাপ অনেক সময় বের হয়ে যায়। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবেন পেচ্ছাপ করার সময় কোনোভাবে জোর বা চাপ দেবেন না।
- পেচ্ছাপের সংক্রমণ যাতে না হয় তার দিকে নজর রাখা দরকার।
- কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় তা লক্ষ রাখা দরকার। প্রয়োজনে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটান। বেশি ফাইবারযুক্ত খাবার (যেমন—সবুজ শাকসবজি, ফল) খান। পায়খানা কষা হলে তা মলদ্বারে বা কোলোনে জমা হয়ে পেচ্ছাপের থলির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে উপসর্গ বাড়ে।
- অনেক ওষুধ এই ধরনের উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়। যেমন—অবসাদের ও নিউরোজেনিক ব্যথার জন্য Amitriptyline, চুলকানি ও সর্দি-হাঁচির জন্য Cetrizine। ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে বিকল্প ওষুধ ব্যবহার করুন।
- তাছাড়া মূত্রবর্ধককারী গোত্রের ওষুধও (Frusemide, Torsemide, Spironolactone, ইত্যাদি) উপসর্গ বাড়িয়ে দেয়।
- অন্তর্বাসের মধ্যে সুতির কাপড় ভাঁজ করে প্যাডের আকারে বা ডায়াপার ব্যবহার করা যেতে পারে যাদের ক্ষেত্রে কাপড়ে পেচ্ছাপ হয়ে যায়।
- অনেক সময় কিছু ব্যায়াম ও ফিজিয়োথেরাপির মাধ্যমে বেশি সময় পেচ্ছাপ ধরে রাখার চেষ্টা অভ্যেস করা হয়। অবশ্যই এটি চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ও ফিজিয়োথেরাপিস্ট-এর তত্ত্বাবধানে করা প্রয়োজন।
- যাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র জীবনযাত্রার পরিবর্তনে সম্ভব হয় না বা রোগের পর্যায় ও উপসর্গ বেশি তাদের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের পাশাপাশি ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়।
- আলফা ব্লকার গোত্রের ওষুধ প্রস্টেট গ্রন্থির মধ্যের ও মূত্রথলির মুখের মাংসপেশিকে নমনীয় করে, ফলে পেচ্ছাপে সাহায্য করে। যেমন—Tamsulosin, Alfuzosin, ইত্যাদি।
- ৫-আলফা রিডাকটেস ইনহিবিটরস গোত্রের ওষুধ প্রস্টেট গ্রন্থির আকৃতি কমাতে সাহায্য করে। যেমন—Finasteride, Dutasteride, ইত্যাদি।
- অনেক ক্ষেত্রে ক্যাথেটার ব্যবহার করার নির্দেশ দিতে পারেন ডাক্তার। ক্যাথেটার হল একটি রাবারের তৈরি সরু নল যা মূত্রথলি থেকে পেচ্ছাপকে শরীরের বাইরে বের করে। হঠাৎ করে পেচ্ছাপ আটকে গেলে বা দীর্ঘদিন ধরে পুরো পেচ্ছাপ মূত্রথলি থেকে না বের হলে এই ধরনের চিকিৎসা করার দরকার পড়তে পারে। রোগের প্রকারভেদে সাধারণ রাবারের ক্যাথেটার (যা প্রতিবার ব্যবহার করার পর মূত্রথলি থেকে বের করে দিতে হয়) বা Foley's ক্যাথেটার (যা কিছু দিন মূত্রথলির মধ্যে রাখা যায়) ব্যবহার করা হয়। Foley's ক্যাথেটার ব্যবহারে পেচ্ছাপের সংক্রমণ-এর সম্ভাবনা বাড়ে।

মদ পান করা বন্ধ করুন। কফি ও কোলা জাতীয় খাবার যতটা কম খাওয়া যায় ততটাই শ্রেয়। খাবারে কৃত্রিম মিষ্টিদ্রব্যের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। সন্ধ্যের পর জল পান কমান। কিন্তু অবশ্যই লক্ষ রাখবেন যাতে দিনের বেলায় যথাযথ পরিমাণে জল পান করা হয়।

- যদিও সংখ্যায় কম কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের দরকার পড়ে।
- অনেক সময় ওপেন সার্জারির মাধ্যমে প্রস্টেট গ্রন্থির অপারেশন করতে হতে পারে। যাদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট গ্রন্থি খুব বড়ো আকারের হয় তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির দরকার পড়ে।
- অনেক সময় রিসেক্টোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে মূত্রনালির মধ্য দিয়ে ঢুকে প্রস্টেট গ্রন্থির অংশ বিশেষ অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে Transurethral resection of the prostate (TURP) বলে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের সর্বসময়ের চিকিৎসক।

আর এক স্টোনের কাহিনি

ডা. অনিন্দিতা

আর এক স্টোনের কাহিনি জানব আজ। আমাদের শরীরের সাথে স্টোনেদের সম্পর্ক যে জোরালো, তা তো মানতেই হবে। এই যেমন আঙুলের আংটিতে স্টোন (জ্যোতিষীর ঠকবাজি), গলব্লাডার স্টোন (পিত্তথলিতে পাথর), রেনাল স্টোন (কিডনিতে পাথর) আরও কত কী। যদিও আঙুলের আংটির স্টোনের সমস্যাহরণকারী ক্ষমতার কোনো ভেরিফাইড সার্টিফিকেট নেই, কিন্তু গল স্টোন আর রেনাল স্টোন যে শরীরে কী সমস্যা তৈরি করে তা তো আপনারা এত দিনে চোখে দেখে নিয়েছেন কিংবা কানে শুনে নিয়েছেন।

আর এক স্টোন এদের মতো এত পপুলার না হলেও শারীরিক

চিত্র ১. মানব রেচনতন্ত্র

সমস্যা তৈরিতে কিন্তু সিদ্ধহস্ত। আজকে আমরা যে স্টোন নিয়ে আলোচনা করব তা হল ব্লাডার স্টোন অর্থাৎ মূত্রথলিতে পাথর। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই পাথরের খপ্পরে পড়লেও পুরুষদের মধ্যে ব্লাডার স্টোন নিয়ে ভোগান্তি বেশি দেখা যায়। তাছাড়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও ব্লাডার স্টোনের সম্ভাবনা দেখা যায়।

ব্লাডার স্টোনের ফলে যে উপসর্গগুলি দেখা যায়, তা হল—

- মূত্র ঘন ঘন হয়। দিনে যত বেশি বার হয় তার থেকে রাতে কম হয়;
- তলপেটে ব্যথা;
- হিমাচুরিয়া বা মূত্রে রক্ত;
- মূত্রে জ্বালা-যন্ত্রণা, সাথে জ্বর।

যেকোনো সমস্যা সমাধান করতে হলে যেভাবে সমস্যার মূলে পৌঁছোতে হয়, সেইভাবে ব্লাডার স্টোন থেকে রক্ষা পেতে আসুন আগে তার জন্ম ইতিহাস একটু জেনে নিই।

ব্লাডার স্টোন বা মূত্র থলিতে পাথর কী ও কেন?

মানুষের রেচনতন্ত্রের একটি অংশ হল মূত্রথলি বা ইউরিনারি ব্লাডার বা সংক্ষেপে শুধু ব্লাডার। সম্পূর্ণ রেচনতন্ত্রটি গঠিত দু-টি কিডনি বা বৃক্ক (যেখানে শরীরে সংবহনকারী রক্ত পরিশোধিত হয় এবং দূষিত পদার্থসমৃদ্ধ মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়), দু-টি রেচন নালি বা ইউরেটার (যার মাধ্যমে দূষিত পদার্থসমৃদ্ধ মূত্র তৈরির প্রক্রিয়া শেষ হয় এবং মূত্র কিডনি থেকে মূত্রথলিতে বা ব্লাডারে এসে পৌঁছোয়)—এগুলো নিয়ে। মূত্রথলি একটি পেশিবহুল পাত্রের মতো। নির্দিষ্ট পরিমাণ মূত্র মূত্রথলিতে জমা হলে মূত্রনালি বা ইউরেথ্রার মাধ্যমে মূত্র শরীরের বাইরে বেরোয়।

মূত্রথলিতে পাথর বা ব্লাডার স্টোন সাধারণত দুই প্রকার হয়।

- প্রাইমারি বা মুখ্য ব্লাডার স্টোন—এক্ষেত্রে পাথর মূত্রথলি বা ব্লাডারেই তৈরি হয়। এবং মূত্রে সংক্রমণের কারণেই এই পাথর সৃষ্টি হয়। এবং মূত্রথলিতে পাথরের রোগে এই ধরনের পাথর সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ।
- সেকেন্ডারি বা গৌণ ব্লাডার স্টোন—এক্ষেত্রে কিডনি থেকে পাথর রেচননালির মাধ্যমে ব্লাডারে আসে এবং ব্লাডারে এসে অপেক্ষাকৃত বড়ো আকার ধারণ করে

সাধারণত মূত্রথলি থেকে মূত্র অতিরিক্ত পরিমাণে বা অতিরিক্ত সময় ধরে জমা থাকলে অর্থাৎ মূত্রথলি থেকে মূত্রের মূত্রনালিতে স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে, মূত্রের মধ্যে দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থসমূহ ক্রিস্টালে পরিণত হয় এবং সেই ক্রিস্টাল পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে পাথর বা স্টোনের সৃষ্টি করে। তাছাড়া মূত্রের মধ্যে রাসায়নিক পদার্থের ঘনত্ব বেড়ে গেলে অর্থাৎ মূত্র ঘন হলে সেক্ষেত্রেও পাথর তৈরির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

যে যে কারণে মূত্রথলি থেকে মুত্রের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হয়

পুরুষ ও মহিলার উভয়ক্ষেত্রেই জননতন্ত্র ও রেচনতন্ত্র শ্রোণিদেশ বা পেলভিসে অবস্থিত।

BHP (Benign Hyperplastic Prostate)—পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড নামক একটি গ্রন্থি মূত্রথলির সামনে এবং পেনিসের পিছনে থাকে এবং এই গ্রন্থিটি মূত্রনালিকে ঘিরে থাকে। ফলে প্রস্টেটের আকার বাড়লে অর্থাৎ বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়াতে মূত্রনালির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে মূত্রথলি থেকে মূত্র নির্গমন বাধাপ্রাপ্ত হয়। মূত্র বেশি সময় ধরে মূত্রনালিতে জমা থেকে পাথর তৈরি হয়।

সিস্টোসিল (Cystocele)—মহিলাদের ক্ষেত্রে ব্লাডার-এর পিছনে থাকে জরায়ু বা ইউটেরাস এবং জরায়ুমুখ বা সারভিক্স। এবং মূত্রনালির পিছনে থাকে যোনি। শ্রোণিদেশের বিভিন্ন মাংসপেশি, লিগামেন্ট দৃঢ়তা প্রদান করে এই অঙ্গগুলির স্বাভাবিক অবস্থান রক্ষা করে। শ্রোণিদেশের পেশি, লিগামেন্ট কোনো কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে এইসব গঠনগুলির স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। যেমন এক্ষেত্রে যোনির সম্মুখ দেওয়ালকে দৃঢ়তা প্রদানকারী মাংসপেশিগুলি দুর্বল হয়ে পড়ায় ব্লাডার পিছনের দিকে অর্থাৎ যোনির দিকে হেলে যায়। এক্ষেত্রে ব্লাডারের পিছনের অংশ বদ্ধ থলির মতো কাজ করে এবং এই অংশে মূত্র জমা

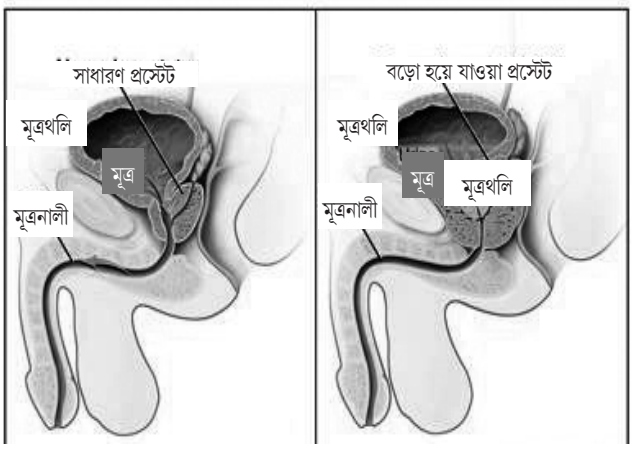

চিত্র ২. বড়ো হয়ে যাওয়া প্রস্টেট

হতে থাকে। এবং ক্রমে মূত্রথলিতে পাথরের সৃষ্টি হয়। অনেকসময় এইরকম মূত্রথলিকে প্রোলাপ্সড ব্লাডারও বলা হয়।

সিস্টোসিল তৈরির কারণগুলি

➦ নর্মাল ডেলিভারির সময় শ্রোণিদেশের পেশির ক্ষতি হলে।

➦ কোষ্ঠকাঠিন্য-এর চিকিৎসা না করা ও জোর দিয়ে বার বার পায়খানা করার অভ্যাসের ফলে।

এছাড়া মূত্রথলিতে পাথর তৈরির আরও কয়েকটি কারণ হল:

নিউরোজেনিক ব্লাডার—এক্ষেত্রে যে স্নায়ুপথ দিয়ে মূত্র নির্গমনের প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়, তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এর ফলে মূত্রথলি থেকে মূত্র সম্পূর্ণরূপে বেরোতে পারে না। ফলে মূত্রথলিতে পাথর সৃষ্টি হয়।

নিউরোজেনিক ব্লাডার-এর কারণগুলি হল:

- স্পাইনাল কর্ড-এ আঘাত;
- ডিস্ক প্রোলাপ্স;
- পোলিয়ো;
- ডায়াবেটিস মেলিটাস বা মধুমেহ;
- সেরিব্রাল ডিজিজ;
- স্পাইনা বাইফিডা।

ব্লাডার ডাইভার্টিকুলা: ব্লাডার ডাইভার্টিকুলা আসলে একটা থলির মতো অংশ যা ব্লাডার-এর দেওয়াল থেকে তৈরি হয়। এটা কিছু ক্ষেত্রে জন্মগত হয়, আবার অনেকক্ষেত্রে বার বার মূত্রনালির সংক্রমণের ফলে অথবা প্রোস্টেটের বৃদ্ধির ফলে তৈরি হতে পারে। ডাইভার্টিকুলা খুব বড়ো আকৃতির হলে মূত্র জমা হতে থাকে এই অংশে, ফলে পাথর সৃষ্টি হয়।

তাছাড়া একধরনের মূত্র ধারণ করার সমস্যা সমাধানে ব্লাডার অগমেনটেশন সার্জারি করা হয়। সেই পদ্ধতির পরবর্তী জটিলতা হল মূত্রথলিতে পাথর তৈরি হওয়া।

ব্লাডার স্টোন হওয়ার ঝুঁকি যাদের ক্ষেত্রে বেশি

- মূত্রনালির সংক্রমণে;
- দীর্ঘদিন ধরে শুয়ে থাকা রোগী এবং প্যারাপ্লেজিক রোগীদের;
- গেঁটেবাত বা গাউট রোগে;
- খাদ্যে চর্বি, সুগার ও নুনের আধিক্য এবং ভিটামিন A ও B-এর খামতি;

চিত্র ৩. সিস্টোসিল

- হাইপারক্যালসিইউরিয়া। অনেক ক্ষেত্রে মূত্রথলিতে জমা পাথর আকারে ছোটো হলে কিছু দিন পর পেচ্ছাপের সাথেই বেরিয়ে যায়।

মূত্রথলিতে পাথর সন্দেহ হলে যে যে পরীক্ষাগুলো করতে হয় তা হল:

- মূত্রের সাধারণ পরীক্ষা;

- মূত্রের কালচার পরীক্ষা;
- রক্তের সাধারণ পরীক্ষা; আলট্রাসোনোগ্রাফি (USG of KUB or KUBP)—মূত্রথলিতে পাথর নির্ণয়ে এই পরীক্ষা করা হয়।

আলট্রাসোনোগ্রাফিতে মূত্রথলিতে পাথর পাওয়া গেলে এবং সাথে শারীরিক উপসর্গ থাকলে ও পাথর মূত্রপথে না বেরোতে পারলে, চিকিৎসা পদ্ধতি হল সার্জারি।

সার্জারির যে পদ্ধতিগুলো করা হয়:

- ট্রান্সইউরেথ্রাল সিস্টোলিথোলাপেক্সি;
- পারকিউটেনাস সুপ্রাপিউবিক সিস্টোলিথোলাপেক্সি;
- ওপেন সিস্টোস্টোমি।

সার্জারির পরবর্তী জটিলতা হল মূত্রে জীবাণু সংক্রমণ। প্রতি ১০ জনের মধ্যে ১ জনের ক্ষেত্রে ব্লাডার স্টোন সার্জারির পর মূত্রে সংক্রমণ দেখা যায়। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

এছাড়া যে যে কারণে মূত্রথলিতে পাথর সৃষ্টি হয় সেই কারণগুলির চিকিৎসা করাও প্রয়োজন। যেমন—

- প্রোস্টেটের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুখে খাবার ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় প্রাথমিকভাবে। কারও কারও ক্ষেত্রে সার্জারিরও প্রয়োজন হতে পারে।
- সিস্টোসিলের ক্ষেত্রে পেসারি নামক একটি যন্ত্র যোনিদ্বারে ঢুকিয়ে ব্লাডারের স্বাভাবিক গঠন বজায় রাখা হয়। সিস্টোসিল জটিল হলে সার্জারির প্রয়োজন হয়।
- ব্লাডার ডাইভার্টিকুলার চিকিৎসাও হল সার্জারি।
- নিউরোজেনিক ব্লাডারের ক্ষেত্রে মূত্র ত্যাগের কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন করতে হয়। ক্যাথেটার ব্যবহার করা হয়।

মনে রাখতে হবে মূত্রথলিতে পাথর হওয়া আটকানোর জন্য কিছু সাবধানতা অবশ্য মেনে চলা কর্তব্য, যেগুলি হল:

- দিনে ২ থেকে ৩ লিটার জল খেতে হবে যাতে মূত্র বেশি গাঢ় না হয়;
- মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হলে মূত্র বিসর্জনে দেরি না করা;
- প্রথম বার মূত্র ত্যাগের পর ১০ থেকে ২০ সেকেন্ড পর আবার মূত্র ত্যাগ করা। (যদি প্রথম চেষ্টায় মূত্র সম্পূর্ণ না বেরিয়ে যাওয়ার অনুভূতি হয়)। মূত্র ত্যাগের এই পদ্ধতিকে Double Voiding Technique বলে;
- কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে তার চিকিৎসা করা;
- মূত্র বিসর্জনে অযথা দেরি না করা।

এখানেই আজকে আর এক স্টোনের কাহিনি শেষ করলাম। অবৈজ্ঞানিক প্রথা ও কুসংস্কার থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে মুক্ত রেখে সুস্থ জীবনযাপনের দিকে আসুন একসাথে এগিয়ে চলি আমরা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অনিন্দিতা, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের চিকিৎসক।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি
বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান:

কলকাতা: সুমন্ত বিশ্বাস (৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (৬৯৮৮-২২৪১), বই-চিত্র (কফি হাউস তিনতলা), পাতিরাম, ক্রান্তিক, মনীষা (কলেজ স্ট্রিট), অমর কোলে (বি.বা.দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন) সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী), রথীন-দা (গোলপার্ক) সৈকত প্রকাশন (আগরতলা)।

যোগাযোগ: ই-মেল-utsamanush1980@gmail.com

“বাচ্চা কিচ্ছু খায় না”

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা

বাচ্চার জন্মের ছ-মাস পর থেকে তাকে মায়ের দুধ ছাড়াও অন্য খাবার খাওয়াতে হয়। এবার তার পরের সময়টায় আসি। এই সময় থেকেই মায়েরা বাচ্চাকে খাওয়াতে গিয়ে জেরবার হন। প্রত্যেকটি শিশু-বহির্বিভাগে ‘বাচ্চা কিচ্ছু খায় না’ বলা মায়েদের ভিড় লেগেই থাকে। অবশ্য, ডাক্তারদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তো সবসময় ‘স্মৃতিসুধায় ভরা থাকে’ . . . মনে পড়ল, পোস্ট-গ্রাজুয়েট-ট্রেইনি থাকার সময় একদিন নাইট-ডিউটি দিচ্ছি। সময় রাত তিনটে।

—ডাগদারসাব . . .

নেহাত পয়সা খরচ করার অন্য উপায় না খুঁজে পেলে তবেই বাচ্চাকে সারাদিন সেরেল্যাক, নেস্টাম ইত্যাদি খাওয়াবেন। সাধারণ চাল-ডাল-সবজি ঘেঁটে খিচুড়ি বানান, সেটাই অনেক ভালো হবে।

(হন্তদন্ত হয়ে এক মহিলা ইমার্জেন্সিতে এলেন। কোলে বছর দেড়েকের বাচ্চা)

ডাক্তারবাবু সারাদিনের পরিশ্রম শেষে সবে একটু চোখ বুজেছেন। . . . (ও হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগছে হয়তো কিন্তু ডাক্তারদেরও ঘুম পায়, খিদেয় পেট কামড়ায়, রাগ হয়, কবিতা পায়। পায়খানা, পেচ্ছাব . . . সেগুলোও করতে হয়)

তো ডাক্তারবাবু চোখ কচলে, চশমাটা লাগিয়ে কোনোরকমে এসে বসলেন। ভেতরে আলো বন্ধ ছিল, বাইরে উজ্জ্বল আলোয় চোখ পিটপিট করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন,

—কী হয়েছে?

—ডাগদারসাব, ডাগদারসাব . . .

—হুঁ

—মেরা বাচ্চা তিন মাহিনা সে কুছ নেহি খা রহা হ্যায়. . .

যাই হোক, কাজের কথায় আসি . . .

১. সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চার ওজন ৫-৬ মাসে জন্মের সময়ের ওজনের দ্বিগুণ, এক বছরে তিনগুণ হয়।

২. ঠিক ছ-মাস পূর্ণ হলেই পরের দিন থেকে বাচ্চাকে খিচুড়ি দিতে শুরু করুন। অন্নপ্রাশন, পাড়া খাওয়ানো, ঠাকুরনামের জন্য দেরি করলে আদপে বাচ্চার ক্ষতি। সব কিছু তো বাচ্চার ভালোর জন্যই, তাই না?

৩. সহজেই পাওয়া যায় এমন খাবার খাইয়েই বাচ্চাকে স্বাভাবিক পুষ্টি জোগানো যায়।

বেদানার লাল আর রক্তের লাল এক নয়। এইভাবে ‘সব লাল হো জায়েগা’ হবে ভাবলে ভুল করছেন।

৪. নেহাত পয়সা খরচ করার অন্য উপায় না খুঁজে পেলে তবেই বাচ্চাকে সারাদিন সেরেল্যাক, নেস্টাম ইত্যাদি খাওয়াবেন। সাধারণ চাল-ডাল-সবজি ঘেঁটে খিচুড়ি বানান, সেটাই অনেক ভালো হবে। হাতে সময়ের খুব অভাব না হলে কৌটোর খাবার খাওয়াবেন না।

৫. নির্দিষ্ট বয়েসের পর ফল খাওয়ানো খুব উপকারী। মাথায় রাখুন—ফল বললে ‘ডাক্তারবাবু, বেদানা খাবে?’ মাথায় আনবেন না। বেদানার লাল আর রক্তের লাল এক নয়। এইভাবে ‘সব লাল হো জায়েগা’ হবে ভাবলে ভুল করছেন। রোজ কলা বা পেঁপে রাখুন। বাদবাকি যেকোনো মরশুমি ফল।

৬. নতুন খাবার শুরু করলে এককালীন একটিই শুরু করুন। নইলে কোনো বিশেষ খাবার সহ্য না হলে বুঝতে পারবেন না।

৭. ভাত/খিচুড়ি খাওয়ার আগে বাচ্চাকে কিছুক্ষণ খালি পেটে রাখুন। খিদেটা পেতে দিন। আপনি এক ঘণ্টা ছাড়া চর্ব্যচূষ্য খাইয়ে যাবেন আবার ভাববেন বাচ্চা খেতে বসে এক থালা ভাত খেয়ে ফেলবে—ভুল করছেন।

চিত্র ১. জাতীয় পুষ্টি-পুনরুদ্ধার-কেন্দ্রের (পরশ) গাইডলাইন থেকে নেওয়া বাচ্চাদের খাদ্যের চার্ট

৮. 'সবার বাচ্চা খায়, আমার বাচ্চা খায় না' . . .

পৃথিবীতে কোনো মায়েরই মনে হয় না তাঁর বাচ্চা ঠিকঠাক খায়, বিশেষত ভারতের মতো দেশে যেখানে লোকে মুটিয়ে যাওয়াকে স্বাস্থ্য হওয়া ভাবেন। আপনার বাচ্চা মঙ্গল গ্রহ থেকে আসেনি। ভালো করে

খিদেটা পেতে দিন। আপনি এক ঘণ্টা ছাড়া চর্ব্যচূষ্য খাইয়ে যাবেন আবার ভাববেন বাচ্চা খেতে বসে এক থালা ভাত খেয়ে ফেলবে—ভুল করছেন।

নিয়ম মেনে খাওয়ান, আপনার বাচ্চাও খাবে।

৯. এই পয়েন্টের বদভ্যাসটি আমারও আছে। অতিরিক্ত মোবাইল খোঁটা। যাইহোক, ফ্রিতে জ্ঞান দিচ্ছি যখন দিয়েই দি, খেতে বসিয়ে বাচ্চার সামনে মোবাইল বা কার্টুন চালাবেন না।

১০. পারলে বাচ্চার সাথে বাড়ির সবাই একসাথে খেতে বসুন।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ।

টুকরোখবর

উত্তরপ্রদেশে শিশু মৃত্যু

উত্তরপ্রদেশে প্রতি বছর ৬১,০০০-এরও বেশি নবজাতক জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য থেকে ইউনিসেফ জানাচ্ছে প্রতি বছর উত্তরপ্রদেশে মোটামুটি ৫৫ লাখ শিশুর জন্ম হয়, তাদের মধ্যে মারা যায় ১,৬৫,০০০।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উত্তরপ্রদেশ শাখায় শিশুস্বাস্থ্যের জেনারেল ম্যানেজার ডা. অনিল বর্মা জানান, নবজাতকের মৃত্যুগুলির ৩৭% হয় জন্মের পর প্রথম দিনে।

গর্ভাবস্থা ও তারপরে মায়ের যত্নের ওপর শিশুমৃত্যুর হার নির্ভর করে। জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সার্ভেতে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের গর্ভবতী মায়েদের প্রতি ৪ জনে মাত্র ১ জন বাধ্যতামূলক ৪টা অ্যান্টিনেটাল চেক আপ করান। ৩৩% প্রসব হয় বাড়িতে। আর ৭৫% নবজাতক জন্মের পরের এক ঘণ্টায় মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত থাকে।

ইউনিসেফ, উত্তরপ্রদেশের ডা. কানুপ্রিয়া সিঙ্ঘল জানান, সারা দেশের মোট শিশুমৃত্যুর ২০% উত্তরপ্রদেশে আর এক মাসের কমবয়সে মৃত্যুর ২৪%-ও এই রাজ্যে।

শিশুমৃত্যুর আরও দুটো বড়ো কারণ কম বয়সে বিবাহ ও রক্তাল্পতা। উত্তরপ্রদেশের ২১% মহিলার আইনি বয়সের আগে বিয়ে হয়। আর ১৫-৪৬ বছর বয়সি মহিলাদের ৫২% রক্তাল্পতায় ভোগেন।

এই মৃত্যুগুলির ৪৪% হল সময়ের আগে জন্মের জন্য। নবজাতকের সংক্রমণ ২০% মৃত্যুর জন্য দায়ী, লেবার রুমে অথবা চিকিৎসাকর্মী ও মা বাবার স্বাস্থ্যবিধির অভাবই সংক্রমণের কারণ। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

খিঁচুনি হলে কী করবেন?

ডা. সুমিত দাশ

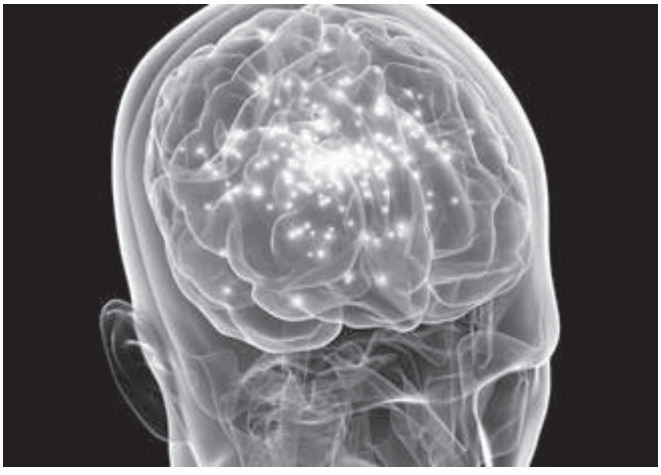

আমাদের গ্রামে বেশ কয়েকজন মৃগী রোগী ছিলেন। প্রত্যেকেই এদের চিনত। স্থানে অস্থানে এদের কারোর খিঁচুনি হলে দেখতাম দুটো জিনিসের জন্য লোকে খুব চেঁচামেচি করছে—জুতো আর চাবি। জুতোর গন্ধ শোঁকালে নাকি মৃগী ঠিক হয়ে যায়!! আর চাবি ঢুকিয়ে তাঁদের চেপে যাওয়া দাঁতের পাটি খোলার চেষ্টা হত। সেই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় অনেক ক্ষেত্রেই দাঁত ভেঙে গিয়ে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমাদের গ্রামের অধিকাংশ লোকই সাধারণত জুতো পরে বেরোত না। আর চাবিও সবার কাছে সবসময় থাকে না। তাই এ দুটো জিনিস জোগাড় করতে করতেই অনেক ক্ষেত্রেই পাঁচ মিনিটের বেশি সময় চলে যেত। আর মৃগীর খিঁচুনি স্বাভাবিক নিয়মেই এই সময়ের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু কৃতিত্বটা জুতো, চাবির কপালেই জুটত। তাই খিঁচুনি সারাতে তাঁদের দাপট বছরের পর বছর অক্ষুণ্ণ থাকত।

যাইহোক, যে মানুষটি তার সামনে প্রথম বারের জন্য খিঁচুনি দেখছেন সেটা তাঁর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। তবে খিঁচুনি দেখে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। ঠান্ডা মাথায় এগুলো করবেন।

জোর করে মানুষটিকে সরানোর চেষ্টা করবেন না। একমাত্র যদি রাস্তায় যেখানে গাড়ি চাপা পড়ার সম্ভাবনা আছে বা জলের মধ্যে যেখানে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে সেখান থেকে তাকে সরিয়ে দেবেন। বরং যেখানে খিঁচুনি হচ্ছে, মানুষটির আশপাশ থেকে চেয়ার, টেবিল, ছুরি, কাঁচি, কাটারি যেগুলোতে আঘাত লাগতে পারে সেগুলো সরিয়ে দেবেন।

যদি সে খালি মেঝেতে শুয়ে থাকে, সম্ভব হলে মাথার নীচে নরম কিছু জিনিস—তোয়ালে, গামছা, চাদর ভাঁজ করে দেবেন। তাহলে মাথায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা কমবে।

গলায় যদি কোনো পোশাক আঁটোসাঁটো করে বাঁধা থাকে তা আলগা করে দিন। যেমন কলার টাই, ওড়না।

খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেলে এবং তিনি যদি অজ্ঞান থাকেন তবে একপাশ ফিরে কাত করে শুইয়ে দিন। তাহলে মুখে জমে থাকা লালা গড়িয়ে পড়বে, শ্বাস নিতে সুবিধে হবে।

তাঁর সাথে থাকুন, জ্ঞান ফিরলে আস্তে আস্তে কথা বলুন যাতে

জোর করে মানুষটিকে সরানোর চেষ্টা করবেন না। বরং যেখানে খিঁচুনি হচ্ছে, মানুষটির আশপাশ থেকে চেয়ার, টেবিল, ছুরি, কাঁচি, কাটারি যেগুলোতে আঘাত লাগতে পারে সেগুলো সরিয়ে দেবেন।

তিনি ঘাবড়ে না যান।

খিঁচুনি কখন শুরু এবং শেষ হল সময়টা লিখে রাখুন।

কখনোই মুখের মধ্যে কিছু দেবেন না (চাবি, আঙুল)। যতক্ষণ না পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছে কখনোই কোনো খাবার বা পানীয় দেবেন না।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কখন অ্যাম্বুলেন্স ডাকবেন?

- যদি আপনি নিশ্চিত হন যে আক্রান্ত ব্যাক্তির এটাই প্রথমবার খিঁচুনি হল।
- যদি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে খিঁচুনি হয়।
- যদি আক্রান্ত মানুষটির পুরোপুরি জ্ঞান না ফেরে বা পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার আগেই বারবার খিঁচুনি হয়।
- যদি খিঁচুনির সময় মানুষটি ভয়ংকরভাবে আহত হন।

মনে রাখবেন মৃগী রোগীকে প্রত্যেকবার খিঁচুনির জন্যেই হাসপাতালে যেতে হয় না। অনেকে নিজের সাথে একটা কার্ড রাখেন যাতে লেখা থাকে তিনি মৃগী রোগী। এটা আছে কিনা সেটা খেয়াল রাখবেন।

কতগুলি বিষয় খেয়াল করে সম্ভব হলে লিখে রাখবেন

এগুলি সেই মানুষটি এবং তাঁর ডাক্তারের জন্যে চিকিৎসার সময় গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে।

- খিঁচুনি হওয়ার আগে মানুষটি কী করছিলেন।
- খিঁচুনির সময় মানুষটির কোনো অস্বাভাবিক অনুভূতি হয়েছিল কি? যেমন—গন্ধ বা স্বাদের।

মনে রাখবেন মৃগী রোগীকে প্রত্যেকবার খিঁচুনির জন্যেই হাসপাতালে যেতে হয় না। অনেকে নিজের সাথে একটা কার্ড রাখেন যাতে লেখা থাকে তিনি মৃগী রোগী। এটা আছে কিনা সেটা খেয়াল রাখবেন।

- আপনি কি এই সময় মানুষটির মেজাজের কোনো পরিবর্তন দেখেছিলেন—যেমন উত্তেজনা, রাগ, উদ্‌বেগ।
- কী দেখে বুঝলেন লোকটির সমস্যা হচ্ছে।

কোনো আওয়াজ—যেমন কেউ পড়ে গেল, খিঁচুনির জন্য অন্য কিছুর সাথে লেগে যাওয়ার আওয়াজ অথবা চোখ উলটে যাচ্ছে বা ঘাড় বেঁকে যাচ্ছে।

- কোনো সতর্কতা ছাড়াই কি হঠাৎ খিঁচুনি আরম্ভ হল?
- মানুষটি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন বা ঘোরের মধ্যে ছিলেন?
- মানুষটির কি শরীরে ‘রঙের’ কোনো পরিবর্তন হয়েছিল যেমন ফ্যাকাশে, লাল বা নীল হয়ে যাওয়া। হলে কোথায় হয়েছিল—মুখ, ঠোঁট, না হাত?
- দেহের কোনো অংশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল বা ঝাঁকুনি দিয়েছিল কিনা। হলে কোন অঙ্গ।
- শ্বাস নেওয়ার কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কিনা।
- অন্য কোনো কাজ করার মতো করছিলেন কিনা। যেমন বিড়বিড় করা, এদিক ওদিক চলে যাওয়া, কাপড় টানছিলেন কিনা।
- কত সময় ধরে খিঁচুনি হয়েছিল।
- প্রস্রাব, পায়খানা করে ফেলেছিলেন কিনা।
- জিভ কেটে গিয়েছিল কিনা।
- খিঁচুনির পরে কেমন ছিলেন।
- এর পরে কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? ঘুমোলে কতক্ষণ?

রাস্তাঘাটে, অফিসে, স্কুল-কলেজ অনেক ক্ষেত্রেই আমরা খিঁচুনি রোগী দেখি। আমাদের কী করণীয় সেগুলি এই নির্দেশিকা অনুযায়ী মাথায় রাখলে আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে সাহায্য করা হবে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সুমিত দাশ, সাইকিয়াট্রিস্ট, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

Advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুক মার্ক, মনীষা গ্রন্থালয়, বই-চিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),

বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

মন নিয়ে কথকতা

(বিশেষ ভূত পর্ব—যদিও ভূতের কোনো ভবিষ্যত নেই!!)

ডা. স্বস্তিশোভন চৌধুরী

লেখাটি মাসকয়েক আগের, একটি ঘটনাক্রমের প্রেক্ষিতে যেতে হয়েছিল একটি স্কুলে, এক বিজ্ঞান সচেতনতা শিবিরে। বলা যেতে পারে, কিছুটা ভূতের ওঝা হয়ে ভূত তাড়াতে! সেই প্রসঙ্গে লেখা, সেই সময়কার, তবে বিষয়টা সবসময়ের। পড়ুন, মনে ধরলে পড়ান!!

সিনেমায় যদিও অন্যরকম, কিন্তু আসলে ভূতের কোনো "ভবিষ্যৎ" নেই। চরিত্রও নেই, আকারও নেই, অস্তিত্ব শুধু মানুষের মনে, আমাদের কল্পনায়।

"ধান ভানতে শিবের গীত" শুরু করতে চাইছি আসলে একদল সদ্য "ভূতাক্রান্ত" ছাত্রীদের ভূত ছাড়ানোর জন্য। শোনা যাচ্ছে এদের ভূত ঝাড়তে বিভিন্ন ওঝাদের দল যথেষ্ট সক্রিয়, কিন্তু লাভের লাভ কিছু হচ্ছে না। "মনের ভূত"-কে তাড়ানো তো চাট্টিখানি কথা নয়।

এইবারে দেখা যাক, জলপাইগুড়ির একটি স্কুলে (বিবেকানন্দ হাইস্কুল, কোনপাকরি) হঠাৎ করে উদয় হয়ে ভূতগুলো করছেটা কী? এরা সব ছাত্রীদের অনেকের ঘাড়ে চেপে তাদের দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করাচ্ছে (ছাত্রদের কাউকে ধরেছে বলে এখনও খবর নেই)। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আঁচড়ে বা গলা টিপে ধরেছে বলেও শোনা গেছে। একজন ছাত্রীর বয়ানে জানা যাচ্ছে যে, এইসময় তাদের কাজকর্মের, আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ তারা নিজেরা করতে পারছে না।

এটাই আসলে "মূল বিষয়"। একজন মানুষ তার "শরীর" আর "মন" মিলিয়েই সম্পূর্ণ মানুষ। এর মধ্যে শরীরের অস্তিত্ব তার আকার, বিস্তার নিয়ে একেবারে ত্রিমাত্রিক। শরীরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় কিছুটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে, আবার কিছুটা তার মনের ইচ্ছায়। উদাহরণ দিয়ে বোঝালে সুবিধা হবে। যেমন, আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র চলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে, একদম প্রায় পুরোটাই, চলতেই থাকে। আবার শ্বাসযন্ত্র চলে আধা-স্বয়ংক্রিয়ভাবে, ইচ্ছা করলে বন্ধ করা যায়, গতি বাড়ানো-কমানো যায়। কিন্তু একদম বন্ধ করে দেওয়া যায় না, বাইরের কোনো সাহায্য ছাড়া। অন্যদিকে, ধরা যেতে পারে আমাদের হাঁটাচলা, খাওয়া-দাওয়া, দৌড়ানো, বা আঁচড়ানো, এইসব নানাকিছু মানুষের ইচ্ছের অধীন। "ইচ্ছা" একটা মানসিক বিষয়। আমরা নানারকম বোধ যেমন, ভয়, দুঃখ, আনন্দ, হিংসা, রাগ ইত্যাদির প্রভাবে যেসব ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মন, তারও আবার মূল শারীরবৃত্তীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে।

আলোচনাটা একটু জটিল হচ্ছে, তবু "ভূতে পাওয়ার" সমস্যাটা বুঝতে এই শরীর ও মনের যৌথ আচরণ, যা নির্দিষ্ট শারীরবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে, সেটা একটু বোঝার দরকার আছে। শরীর আর মন

> এই ধরনের আচরণকে আগে "হিস্টিরিয়া" বলা হলেও এখন সেটা আর ব্যবহার হয় না, বিজ্ঞানসম্মতভাবে। তবে "চালু কথা" হিসেবে ব্যবহার হয়।

পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে কাজ করে বলে, সাধারণ সামাজিক কাঠামোর বোধগম্য ব্যবহার আমরা করে থাকি। কিন্তু কোনো আকস্মিক অভিঘাতে, কল্পনা বা বিশ্বাস-নির্ভর মন, শারীরিক ব্যবহারে এমন অদ্ভুত কিছু করতে থাকে যা সাধারণভাবে বোধগম্য হয় না। এইভাবেই আসে "ডিসোসিয়েটিভ স্টেট" যেখানে দেহ-মনের সংশ্লিষ্ট (অ্যাসোসিয়েটেড) প্রকাশভঙ্গি যায় পালটে। ডিসোসিয়েটিভ অবস্থার প্রকাশভঙ্গি কখনো পালটে হয় "পসেশন স্টেট", গোদা বাংলায় "ভর ওঠা", যা আমাদের সামাজিক জীবনে একধরনের প্রচলিত বিষয়। এখানে ভূত নয়, শরীরে এসে যুক্ত হয় "ভগবান"। সেই সূত্রে মানুষটি

কল্পনায় নিজেকে ভগবানই ভাবতে থাকে, সেইমতো ব্যবহার করে। এই আচরণগুলি কিন্তু মানুষটির "ইচ্ছাকৃত" আচরণ নয়। শোনা যায়, এই বিদ্যালয়েরই এক ছাত্রীর কিছুদিন আগে এই ধরনের "ভর" উঠেছিল। প্রাথমিকভাবে পুজো ইত্যাদি হলেও মনোচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, চিকিৎসায় সুস্থ ছিল, কিন্তু অনিয়মিত চিকিৎসার কারণে আবারও বুঝি কিছু সমস্যা হয়েছে।

এইখানে প্রয়োজন "ডিসোসিয়েটিভ ডিজ়অর্ডার" বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিবরণ; যাতে বলা হয়েছে—

এই অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশত লোপ পেতে পারে,

১. অতীতের স্মৃতির সঙ্গে বর্তমান সময়ের সমন্বয়।

২. নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ধারণা।

৩. তাৎক্ষণিক অনুভূতি।

৪. দেহের বিভিন্ন অংশের নড়াচড়ার উপর নিয়ন্ত্রণ।

এই সচেতন ও নির্দিষ্ট ধরনের নিয়ন্ত্রণ কতটা লোপ পাবে, কত সময় ধরে লোপ পাবে তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা থাকে। এমনকী এটা নির্ধারণ করা সময়েও একটু মুশকিল হয় যে কতটা ইচ্ছার অধীনে আচরণ হচ্ছে, আর কতটা তার বাইরে। এই ধরনের আচরণকে আগে "হিস্টিরিয়া" বলা হলেও এখন সেটা আর ব্যবহার হয় না, বিজ্ঞানসম্মতভাবে। তবে "চালু কথা" হিসেবে ব্যবহার হয়।

ভূত আছে চিন্তায়, মনে। বেশি জাপটে ধরলে ওঝা নয়, চিকিৎসা করানো উচিত মনের রোগের, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। ফলের সম্ভাবনা বেশি।

সাধারণভাবে এই ধরনের আচরণগত সমস্যার ক্ষেত্রে বড়ো মানসিক (বা শারীরিক বা সামাজিক) আঘাতের, যা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে, সমাধান করা যাচ্ছে না, তার একটা যোগসূত্র থাকে। সম্পর্কের টানাপোড়েনও থাকতে পারে। কোনোভাবে আঘাত বা চাপকে মোকাবিলা করবার অক্ষমতা থেকে সমস্যার সূত্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণত প্রবল হয়।

এই স্কুলের ক্ষেত্রে দেওয়ালে একটি "হাতের ছাপ" দেখে অনেকে ভয় পেয়েছিল বলে শোনা যাচ্ছে, আর সেটাকেই কল্পনার আলোতে অনেককিছু ভেবে নিয়ে মানসিক চাপ আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটা একটা সম্ভাব্যতা। (যদিও "অশরীরী"-দের শরীর থাকে না, হাতের ছাপ কীভাবে আসবে, সেটা কেউ একটু ভেবে দেখল না!)

এখানে সমস্যাটির বিশেষত্ব হচ্ছে এর "গণ" চরিত্র। উপরের যে আলোচনা সেটা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির আচরণের সমস্যা। কিন্তু, অনেকের মধ্যে একই ধরনের আচরণ সংক্রামিত হতে পারে, এমন ঘটনা গোটা পৃথিবীতে বহু নথিভুক্ত আছে। এই "গণ" চরিত্র শুধু আচরণগত সমস্যা নয়, আপাতভাবে শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। জাপানের একটি স্কুলে হঠাৎ করে প্রায় ৪০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী বমি ও পেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে নানারকম পরীক্ষায় তাদের এই সমস্যার শারীরিক ভিত্তি সেরকম কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। একইরকম আরও অনেক জায়গায় হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্কুল বা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যারা একধরনের পাঠক্রম, নিয়মাবলির মধ্যে দিয়ে চলে তাদের মধ্যে এরকম আচরণগত সংক্রমণ হয়ে থাকে।

এবারে শেষ করা যাক, বিজ্ঞানের কথায়। আসলে ভূত বা ভগবান, যাই হোক না কেন, তার অস্তিত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, সবটাই লুকিয়ে আছে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর মধ্যে। আমাদের যত আবেগ, আচরণ কিংবা বিশ্বাসের সাথে প্রকৃতির মেলবন্ধনে যেসব ভালো লাগা, মন্দ লাগা, সব কিছুর চাবিকাঠি এখানেই। এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্নায়ু রাসায়নিকের চলাচল, আদান-প্রদানের সূত্রেই আমরা কলকল করে হাসি বা গলা ছেড়ে কেঁদে ভাসাই, রেগে উঠি, গুম হয়ে থাকি বা তেড়ে মারতে যাই। স্বাভাবিক আচরণ যেমন এখানকার নির্দেশে হয়, অস্বাভাবিক আচরণও তাই। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেইসব আদান-প্রদান কিছু বেনিয়মের পথে চলে,

আসলে ভূত বা ভগবান, যাইহোক না কেন, তার অস্তিত্বে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, সবটাই লুকিয়ে আছে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর মধ্যে।

যেরকম সাধারণভাবে হওয়ার কথা তার চাইতে কিছু ব্যাঁকাত্যাড়াভাবে লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় (রিসেপটর বাইন্ডিং)। এইসমস্ত ভাবসাব যে আমরা সবটাই এখনই নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করতে পেরেছি, এমন নয়। তবে জোরদার গবেষণায় আমাদের চেতনার স্তর উন্মোচনের বিষয়ে অনেকটা কাজ হয়েছে, আর বিভিন্ন ধরনের আচরণগত সমস্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দিষ্ট ব্যবস্থাবিধি তৈরি করা আছে, সেই অনুযায়ী চিকিৎসা হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নতি হয়।

এই হল গিয়ে ভূতের রহস্য। ভূত আছে চিন্তায়, মনে। বেশি জাপটে ধরলে ওঝা নয়, চিকিৎসা করানো উচিত মনের রোগের, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। ফলের সম্ভাবনা বেশি।

(এরমধ্যে আর ভূতের উপদ্রব হয়েছে বলে শোনা যায়নি। বিজ্ঞানের বক্কাবাজিতে ভূত বাহাদুর কিঞ্চিৎ গা ঢাকা দিয়েছেন!!!)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. স্বস্তিশোভন চৌধুরী, এমবিবিএস, ডিপিএম, এক সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক।

আমি আসছি

রুমঝুম ভট্টাচার্য্য

এই তারাভরা অনন্ত আকাশ আমার আর ভাল্লাগে না,
ফুটপাতের এক কোনে পড়ে থাকা আমার বাসা ও
ভালোবাসা, আমার শিশুর টলমল পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়া
এই যে থাকবে কি থাকবে না-র মধ্যে ঝুলন্ত বাঁচা
এ আর আমার ভাল্লাগে না।

আমার তরে ছড়িয়ে নিয়ন আলো বেজে ওঠা সিগনালের গান
বৃষ্টি ঝরা মাথায় বারো মাস মেঘের যত আগুন হয়ে ঝরা
এসব কিচ্ছু আমার ভাল্লাগে না, জানেন।

তাই আমি স্টেশনে স্টেশনে, সিগনালে সিগনালে, হাটে মাঠে ঘাটে
শয়ে শয়ে লাখে লাখে হাত বাড়াচ্ছি,
বুকে তৃতীয় বিশ্বের লকেট ঝুলিয়ে।
অনাহারে মরছি মালবাজারে, বরশুলে, লালগড়ে
মাইরি বলছি এই তারা ভরা অনন্ত আকাশ আমার আর ভাল্লাগে না।

এই শ্বাস রুদ্ধ করা বাতাস আমার আর ভাল্লাগে না
হাতে পায়ের খোস-প্যাঁচরা, ফুলে ওঠা পেট,
বেরিয়ে থাকা হাড়-পাঁজরা এসব আমার আর ভাল্লাগে না।

এবার গর্জে ওঠার পালা আমার
দুরন্ত আয়লার মতো আছড়ে পড়ব নিজের অধিকারে
ছিনিয়ে আনব খাদ্য, বাসস্থান,
চিৎকার করে বলব স্বাস্থ্য কোনো ভিক্ষা নয়
স্বাস্থ্য আমার অধিকার।
সাবধান আমি আসছি।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। “সন্দীপ্তাকে মনে রেখে” মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে “মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন”।

এইচআইভি ও দুই মহিলা ডাক্তার

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস

পয়লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইচআইভি দিবস পালিত হল পৃথিবী জুড়ে। ১৯৮৮ সালে এই দিনটিকে চিহ্নিত করা হয়। বিশ্ব এইচআইভি দিবস তিরিশ বছরে পড়ল। এইচআইভি রোগের ঘোড়াকে এখন কিছুটা বল্গা পরানো গেছে সন্দেহ নেই।

হিসেবের খাতা থেকেই বলা যায়—২০১০ সাল থেকে ২০১৭—ভারতে নতুন এইচআইভি রোগী আক্রান্তের সংখ্যা কমানো গেছে শতকরা ২৭ ভাগ, এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমানো গেছে শতকরা ৫৬ ভাগ। রোগ নিয়ন্ত্রণের পথে এটুকু সাফল্য সম্ভব হয়েছে NACO (National AIDS Control Organisation) কর্তৃক নির্ধারিত ও রূপায়িত কিছু কর্মসূচির সাহায্যে। এই কর্মসূচি, এই তৎপরতা সব নেওয়া হল কেন? রোগটা আছে বলে।

১৯৮১ সালে আমেরিকাতে, সানফ্রান্সিসকোর যুবক কেন হর্ন-এর শরীরে যখন বিশ্বের প্রথম এইচআইভি শনাক্ত হল, তখন কে বা বুঝেছিল এই রোগের ভয়াবহতা ! ঠিক দশ বছর পর, ১৯৯১ সালে আমেরিকাতে এই রোগের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় এক মিলিয়ন আর সমগ্র বিশ্বে দশ মিলিয়ন। ১৯৯৮-তে সারা বিশ্বে এইডস মহামারী রূপে ছড়িয়ে পড়েছে ঘোষণা করা হল।

ভারতবর্ষে যদি রোগটার অস্তিত্বই শনাক্ত না হত তাহলে NACO গঠন হত না । এই প্রথম শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যে দু-জন মহিলা ডাক্তারের নাম জড়িয়ে আছে তা আজ কেই-বা মনে রেখেছে—এইচআইভি সংক্রান্ত কোনো আলোচনাসভায় শুনিনি কখনো।

সেলাপ্পান নির্মলা আর সুনীতি সলোমন নামে এই দুই মহিলার নাম কে কে জানেন? নিঃসন্দেহে, খুব কম মানুষ।

সেলাপ্পান নির্মলা ও সুনীতি সলোমন ভারতে প্রথম এইচআইভি ভাইরাস শনাক্ত করেছিলেন ১৯৮৬ সালে। যে সময়ে আমাদের দেশে কেউ এ রোগের কথা ভাবেননি, সাধারণ মানুষ রোগের নামটাই শোনেননি। বিপদটা কোথায় এবং ঠিক কেমন, এটা না জানলে মানুষ "বিপদ"-এর সঙ্গে লড়বেন কীভাবে! এই আবিষ্কারটা যে কত জরুরি ছিল এখনও তেমন করে বুঝেছে কি ভারতবাসী! এই আবিষ্কারের গল্পের সঙ্গে যে সংগ্রাম ও নিষ্ঠা জড়িয়ে আছে তাও কেউ জানেন না।

একটু গোড়া থেকে শুরু করা যাক। ১৯৮২ সাল থেকে আমেরিকাতে সমকামী, যৌনকর্মী ও ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নেওয়া মানুষের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাসের খোঁজ করা শুরু হয়েছিল। সে সময়ে ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের স্বাস্থ্যচিন্তা বা কোনো পরিকল্পনাতে এ রোগের নাম স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি। কয়েক বছর পর—চেন্নাই (তৎকালীন মাদ্রাজ) মেডিক্যাল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ছাত্রী সেলাপ্পান নির্মলা, তাঁর রিসার্চ গাইড সুনীতি সলোমন। শ্রীমতী সলোমন ছাত্রীকে থিসিসের বিষয় দিলেন—"এইচআইভি ভাইরাসের খোঁজ"। ছাত্রী অকূলপাথারে পড়লেন, বিষয়টা নিয়ে প্রথমে গাইডের কাছে একটু অনিচ্ছা প্রকাশও করেছিলেন বই কী। এ রোগের সম্পর্কে তখন না আছে কোনো নথি না কোনো বই না কোনো নির্দেশিকা। অজ তামিল গ্রামের মেয়ে নির্মলা, লাজুক ভীরু শান্ত—কীভাবে যে এগোবেন ভেবে পাচ্ছেন না ।

এর আগে ICMR-এর নেতৃত্বে মুম্বই ও পুণেতে রেডলাইট এলাকা থেকে কয়েকশো রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেছে এইচআইভি খোঁজার জন্য—সবগুলোই নেগেটিভ পাওয়া গেছে। ব্যস, সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে—'ওসব বিচ্ছিরি রোগ আমাদের দেশে ঢোকেনি'। যদি রোগের অস্তিত্বই না থাকে তাহলে সাবধানতারও কোনো প্রশ্ন নেইকো।

যাই হোক—নির্মলা ১৯৮৬-তে কাজ শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স বত্রিশ, দু-টি সন্তানের জননী। অত্যন্ত মধ্যবিত্ত সংসার। সবচেয়ে অসুবিধা রক্তের নমুনা জোগাড় করবেন কোথা থেকে? পুণে, মুম্বইতে এ কাজ করা সুবিধাজনক হয়েছিল ICMR-এর পক্ষে কারণ ওখানে নির্দিষ্ট নথিভুক্ত রেডলাইট এলাকা আছে। মাদ্রাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল শহর—সেখানে ওসব নাম করাও পাপ। সেসময়ে এইচআইভি খোঁজার জন্য শুধু ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের রক্তের নমুনাই নেওয়া হত—কারণ সাধারণভাবে সব মানুষের রক্তে খোঁজ করতে গেলে, সে হবে খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা! নির্মলা মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে 'যৌনরোগ বিভাগ' (সে সময়ে সুরক্ষা ক্লিনিক-এর ভাবনা আসেনি, বিভাগটি

মুম্বই ও পুণেতে রেডলাইট এলাকা থেকে কয়েকশো রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেছে এইচআইভি খোঁজার জন্য—সবগুলোই নেগেটিভ পাওয়া গেছে। ব্যস, সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে—'ওসব বিচ্ছিরি রোগ আমাদের দেশে ঢোকেনি'।

এভাবে নাম দিয়েই দেগে দেওয়া হত আর রোগীরা তার ছায়া মাড়াতে ইতস্তত করত)-এ যাওয়া আসা শুরু করলেন যাতে যৌনকর্মীদের খোঁজ পাওয়া যায়। ঠিক পথেই গিয়েছিলেন—কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল বই কী। নির্মলা দেখলেন—এদের অনেকের ফর্মে ঠিকানার জায়গায় লেখা আছে "V Residence'। খোঁজ নিয়ে জানা গেল—V হল গিয়ে Vigilance—এই বাড়িগুলোতে ভবঘুরে এবং চালচুলোহীন যাদের পেশা সন্দেহজনক বলে মনে করে পুলিশ, তাদের রাখা হয়। ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে দু-একজন যৌনকর্মীর খোঁজ পেলেন নির্মলা। এবার তাদের সঙ্গে কথা বলে আরও অসংগঠিত এই পেশার মহিলার সন্ধান পাওয়া গেল। রক্ত নেওয়ার কাজ আরম্ভ করলেন। হাতে দস্তানা বা কোনোরকম সাবধানতাই তখন উনি নেননি—জানা ছিল না যে! রোজ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে রক্ত সংগ্রহ করার মতো বাসভাড়া দেওয়াও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তখন সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন নির্মলার স্বামী বীরাপ্পন মহামূর্তি। তিনি কাজে যাবার আগে তাঁর স্কুটারে নির্মলাকে সেদিনের রক্ত

A cheerless triumph

D

সংগ্রহের অঞ্চলে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। নির্মলা রক্ত সংগ্রহ করতেন—সেই যৌনকর্মীরা জানত যৌনরোগের জন্য রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। সবাই অবশ্যই বিনা বাধায় রক্ত দিতে রাজি হননি বলাই বাহুল্য—দেশজুড়ে ২০, ৭৫৬ টি ICTC (ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং অ্যান্ড টেস্টিং সেন্টার, ২০১৬ সাল পর্যন্ত) স্থাপিত হবার অনেক আগেই নির্মলা নিজস্ব পদ্ধতিতে তাদের সঙ্গে কথা বলে কাউন্সেলিং করতেন। রক্ত সংগ্রহ তো হল—এবার এইচআইভি শনাক্তকরণের কোনো পরবর্তী ব্যবস্থাই তখন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে নেই। সুনীতি সলোমন তাঁর থোরাসিক সার্জন স্বামীর কাছ থেকে কিছু যন্ত্রপাতি ধার করে নিজে রক্ত থেকে সেরাম আলাদা করে নির্মলাকে দিতেন। নির্মলা সেই সেরামের নমুনা নিজের বাড়ির ফ্রিজে জমা করতেন। হ্যাঁ, খাবার-দাবারের পাশেই। মাদ্রাজের নিকটতম যেখানে এলিজা টেস্টের ব্যবস্থা আছে, সে হল ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ, ভেলোর—দু-শো কিলোমিটার দূরত্ব! নির্মলা আর তাঁর স্বামী বীরাপ্পন মোটামুটি সপ্তাহে একবার, আইসবক্সে রক্তের নমুনা নিয়ে সারারাত ট্রেনজার্নি করে কাটপাডি পৌঁছাতেন, সেখান থেকে অটোতে সিএমসি ভেলোর। এত কষ্ট করে কাজ করার সময়ও তাঁরা একদম নিশ্চিত ছিলেন কোনো রক্তে এইচআইভি মিলবে না। ভেলোরে ভাইরোলজি বিভাগের দায়িত্বে

ছিলেন তখন ডাক্তার জ্যাকব টি জোনস। নির্মলা সবরকম সহযোগিতা পেয়েছিলেন এখানে। ডা. জোনস দু-জন সহকারী নিযুক্ত করেছিলেন নির্মলাকে সাহায্য করার জন্য—পি জর্জ বাবু ও এরিক সিমোস।

সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে নির্মলার। এলিজা কিট-এ রক্তের নমুনা ফেলার পর ইলেকট্রিক লাইন চলে গেছিল। সবাই মিলে চা খেতে গেছিলেন। ফিরে এসে প্রথমে ঢাকা খুললেন মি. বাবু—চমকে ঢাকনাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে বললেন—"এটা কি ছেলেখেলা!!" নির্মলা ততক্ষণে যা দেখার দেখে ফেলেছেন। ছ-টি রক্তের নমুনা এলিজা পরীক্ষায় হলুদ বর্ণ হয়েছে !! অর্থাৎ এইচআইভি পজিটিভ !! মি. সিমোস পুনরায় পরীক্ষা করলেন—না , কোনো ভুল নেই। ছ-টি রক্তের নমুনা এইচআইভি পজিটিভ! তাড়াতাড়ি মাদ্রাজে ফিরে শ্রীমতী সলোমনকে সব জানালেন নির্মলা। নির্মলা যাঁদের রক্ত নিয়েছিলেন, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তাঁদের পরিচয় গোপন রাখবেন। কিন্তু এ এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে—আবার তাঁদের কাছে যেতেই হল। এবার সুনীতি সলোমন, নির্মলা, মি. বাবু ও মি. সিমোস—এই চারজন মিলে গেলেন। ঠিকমতো বোঝানোর পর তাঁরা আবার রক্ত দিতে রাজি হলেন, আর তখুনি রক্তের নমুনা নিয়ে সিমোস উড়ে গেলেন আমেরিকা। কেন? এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ভারতে তখনও Western Blot Test-এর কোনো ব্যবস্থাই নেই। অন্যান্য Rapid Test তখন পৃথিবীর কোথাও নিশ্চিত হবার জন্য করা হত না। Western Blot-ই ছিল একমাত্র নিশ্চিত হবার উপায়। Western Blot Test-এ একই ফল—পজিটিভ। এবার সুনীতি সলোমন অফিসিয়ালি সব জানালেন ICMR-কে—ICMR জানাল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে। প্রধানমন্ত্রী দপ্তর থেকে খবর এল তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্যমন্ত্রী মি. হান্ডের কাছে। সংসদীয় অধিবেশনে উনি এ খবর জানালেন সবাইকে। সুনীতি ও নির্মলা এক আবিষ্কার করলেন—ভারতে প্রথম এইচআইভি রোগী আবিষ্কার, কিন্তু এ এমন এক আবিষ্কার যা কোনো উল্লাস নিয়ে এল না। অনেকেই বিশ্বাস করলেন না, এমনকী ধিক্কার দিলেন দুই মহিলাকে—দেখ রিপোর্টে কীসব ভুলভাল আছে, অথবা তামিলনাড়ুর মতো রক্ষণশীল রাজ্যে ওই সব নোংরা পশ্চিমি রোগ হতেই না। সুনীতি সলোমন মহারাষ্ট্রের মানুষ বলে প্রাদেশিক বিরাগভাজনের কথাও শুনতে হয়েছে।

সেই ছ-জন এইচআইভি পজিটিভ রোগীর পরের ইতিহাস আজ অজানা নয়—দাবানলের মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। সারা দেশে এইডস রোগী সর্বোচ্চ সংখ্যায় গিয়ে পৌঁছেছিল ২০০৫ সালে—সংখ্যাটি ৫.১ মিলিয়ন! এইডস রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য NACO অনেক পরিকল্পনা নিয়েছে, ICTC-তে রোগ নির্ণয় ও কাউন্সেলিং, চিকিৎসার জন্য অনেক ART Centre, অনেক ফান্ড—সব কিছু একটা ছকে ফেলে রোগ নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে, আশার কথা।

যদি চেন্নাইয়ের ওই দুই মহিলা ডাক্তার কোনো কিছু প্রাপ্তির আশা না করেই, ১৯৮৬ সালে প্রায় হাওয়ার পেছনে ধাওয়া করে ছ-জন এইচআইভি রোগীকে আবিষ্কার না করতেন তাহলে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা আরও অনেক বাড়ত সন্দেহ নেই। নিয়ন্ত্রণ আরও কত বছর পিছিয়ে যেত কে জানে।

সুনীতি সলোমন ২০১৬ সালে গত হয়েছেন। নির্মলা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কোনো পুরস্কারের আশায় তাঁরা কাজ করেননি, তাঁদের কোনো আপশোসও ছিল না। বিবিসি-তে একটা সাক্ষাৎকারে নির্মলাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—"আপনার গ্রামে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এই আবিষ্কারের জন্য?" উনি বলেছিলেন, "এমন একটা গ্রামে আমার জন্ম যেখানে এ ধরনের খবরের কোনো অর্থই নেই, না উল্লাস না নিন্দা।"

এই আবিষ্কারের নেপথ্যের মহিলাদ্বয় আজও নেপথ্যে। তাতে আর আশ্চর্য কী ? এমনই হয়। ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স গঠন আবিষ্কারের জন্য জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রীক নোবেল প্রাইজ পেলেন, "ওয়াটসন ক্রীক মডেল" সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। অথচ ওনাদের এই মডেল তৈরি সম্ভবই হত না—যদি না Rosalind Franklin নামের

অনেকেই বিশ্বাস করলেন না, এমনকী ধিক্কার দিলেন দুই মহিলাকে—দেখ রিপোর্টে কীসব ভুলভাল আছে, অথবা তামিলনাড়ুর মতো রক্ষণশীল রাজ্যে ওই সব নোংরা পশ্চিমি রোগ হতেই না। সুনীতি সলোমন মহারাষ্ট্রের মানুষ বলে প্রাদেশিক বিরাগভাজনের কথাও শুনতে হয়েছে।

মহিলা বিজ্ঞানী, ডিএনএ-র রেডিও বিচ্ছুরণ স্টাডি ছবি তুলে তুলে ওনাদের ভুলগুলো ধরিয়ে না দিতেন। ব্রিন্ডা ম্যাডক্স-এর লেখা *The dark lady of DNA* বইটি না পড়া পর্যন্ত পৃথিবী রোজালিন্ড-এর নামও শোনেনি—এখনও কতটা শুনেছে বা মনে রেখেছে সন্দেহ আছে। রোজালিন্ড অনেক আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন—তাঁর মডেলের নোবেল পাওয়া, তাঁর বঞ্চনা কিছুই দেখে যাননি।

যাঁরা সত্যিকারের কাজ করেন, তাঁরা শুধু কাজের দিকেই মনঃসংযোগ করেন, নামপ্রচারের দিকে নয়। জাগতিক কোনো পুরস্কার এল কি গেল তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না। তবু মনে হয়—এই মহিলা বৈজ্ঞানিকদের নাম কি আর একটু সামনে আসা উচিত ছিল না!

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ডিভিডি। চর্মরোগ চিকিৎসক।

স্তনদুগ্ধ ও কয়েকটি তথ্য

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা

১. শিশুর জন্মের পরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্তন্যপান শুরু করা উচিত। সিজারিয়ান সেকশন হলে ব্যথার জন্য মায়ের সামান্য অসুবিধে হতে পারে, সেক্ষেত্রেও স্তন্যপান শুরু করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ির অন্যান্যরা মাকে শারীরিক ও মানসিক অবলম্বন দিন।

২. কোনোভাবেই মধু, বাবার আশীর্বাদী জল, চরণামৃত বা অন্য কোনোকিছু মুখে দেবেন না। মনে রাখুন, শুধু এবং শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ।

৩. বাচ্চা জন্মের পর প্রথম ৩-৪ দিন হলদেটে, ঘন, অল্প পরিমাণ দুধ (colostrum) বেরোয়। এটি অনাক্রম্যতা সৃষ্টিকারী পদার্থ ও ভিটামিনে ভরপুর। এটি বাচ্চার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেকে অজ্ঞানতাবশত এই দুধ ফেলে দেন, যা সর্বতোভাবে ভুল।

৪. বাচ্চা প্রথম ৬ মাসে শুধুমাত্র বুকের দুধই খাবে। অন্য কিচ্ছু না, জলও নয়। বুকের দুধে ৮৮% জল থাকে, কাজেই গ্রীষ্মকালেও বাচ্চার কোনোরকম জলের ঘাটতি হয় না।

৫. মাতৃদুগ্ধ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি, অন্যান্য গ্রোথ-ফ্যাক্টর ও উৎসেচকে ভরপুর। মাতৃদুগ্ধপায়ী বাচ্চার অ্যালার্জি, কানের ইনফেকশন, দাঁতের সমস্যা কম হয়। মানসিক বিকাশ ভালো হয়।

৬. শুধু বাচ্চা নয়, মায়ের দিক থেকেও ব্রেস্ট ফিডিং খুব প্রয়োজনীয়। জরায়ুর আগের অবস্থায় ফিরে আসা, বাচ্চা হওয়ার পরবর্তী রক্তক্ষরণ রোধ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে সাহায্য করে।

৭. ঘন ঘন দুধ খাওয়ানো বিশেষত রাতে দুধ খাওয়ালে বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ে। মায়ের সুষম আহার, ঘুম ও মানসিক সুস্থিরতা বুকের দুধ বাড়ায়।

৮. বোতলে দুধ খাওয়ানো, চুষি ধরানো, চিনি-জল, মধু ইত্যাদি দিলে বুকের দুধ কমে যায়। এই প্রসঙ্গে বলি, হোমিয়োপ্যাথ ও অ্যালোপ্যাথবাবুরা অনেকে খুব গ্রাইপ-ওয়াটার প্রেসক্রাইব করেন। এই বস্তুটির কার্যকারিতা নিয়ে কোনো প্রমাণ নেই। এটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক জিনিস যা বুকের দুধের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে।

৯. প্রথম দু-সপ্তাহের পর পরিণত দুধ (mature milk) আসা শুরু হয় যার প্রথমভাগে জলের পরিমাণ বেশি থাকে, বাচ্চার তৃষ্ণা মেটায়। শেষের ঘন দুধে ফ্যাটের ভাগ বেশি থাকে, এটি বাচ্চার শক্তি জোগায়। কাজেই দু-টিই দরকারি। পাতলা দুধ চেপে ফেলে দিয়ে অনেকে শুধু ঘন দুধ দেন, এটা ভুল।

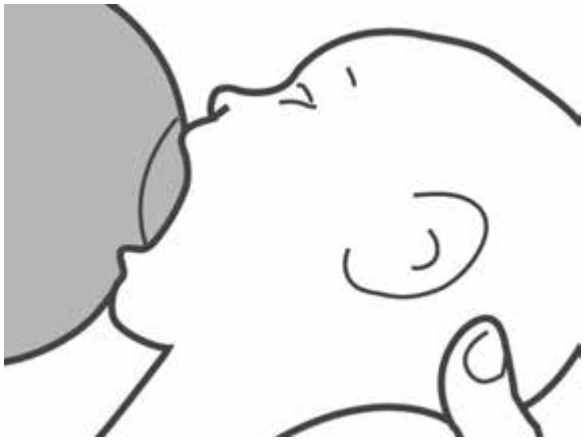

চিত্র ১. বুকের দুধ পান করানোর সঠিক পদ্ধতি

১০. দুধ পান করানোর সময় বাচ্চাকে সঠিকভাবে ধরাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরামদায়কভাবে পিঠের পেছনে কোনো একটা অবলম্বন দিয়ে বসুন। হেলান দিয়েও খাওয়ানো যেতে পারে। বাচ্চার মুখের ওপর স্তন চাপিয়ে দেবেন না, বরং বাচ্চাকে স্তনের দিকে আনুন। বাচ্চার মাথা, ঘাড় এবং শরীর এক সরলরেখায় রাখতে হবে, বাচ্চার পেট মায়ের পেটে স্পর্শ করে থাকবে, নাক স্তনবৃন্তের কাছে আসবে। শুধুমাত্র স্তনবৃন্ত নয়, পুরো কালো অংশের বেশিরভাগটা বাচ্চার মুখের মধ্যে দিতে হবে। এভাবে খাওয়ার সময় বাচ্চার চিবুক স্তনে স্পর্শ করে থাকবে, নীচের ঠোঁট উলটে যাবে।

কয়েকটি মেসেজ:

➢ ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সব মা সমান দক্ষতায় স্তন্যপান করাতে পারেন।

➢ 'বুকের দুধ হচ্ছে না' এটি অধিকাংশ সময় ভুল ধারণা। যে বাচ্চা দুধ খেয়ে ২-৩ ঘণ্টা ঘুমোচ্ছে, ওজন বাড়ছে এবং দিনে ৬-৮ বার পেচ্ছাব করছে তার দুধের অভাব হচ্ছে না। দয়া করে 'দুধ হচ্ছে না' বলে মায়ের মানসিক চাপ বাড়াবেন না, তাতে দুধ কমে যায়।

➢ পাড়ার হাতুড়ে, ওষুধ দোকানের কর্মচারীর পরামর্শে বাচ্চাকে বাইরের দুধ খাওয়াবেন না। এতে বাচ্চার ডায়রিয়া ও অন্যান্য ক্ষতি হতে পারে। আর হ্যাঁ, হরলিক্স-কমপ্ল্যান ইত্যাদি খাইয়ে অর্থ ধ্বংস ছাড়া কোনো লাভ হয় না।

➢ বারে বারে সাবান দিয়ে স্তন ধুয়ে ফেলার কোনো দরকার নেই। স্নানের সময় একবার ধুলেই চলবে। বারে বারে ধুলে বা দুধ টানতে থাকা অবস্থায় জোর করে স্তনবৃন্ত ছাড়িয়ে আনতে গেলে স্তনবৃন্ত ছড়ে যেতে পারে। যদি ছড়েও যায়, কোনো মলম ইত্যাদি না লাগিয়ে বুকেরই ঘন দুধ ওই জায়গায় লাগিয়ে দিন।

➢ ঘন ঘন দুধ না দিলে দুধ জমে ব্যথা হতে পারে। একটু ম্যাসাজ করে, গরম জলের সেঁক নিলে ব্যথা কমবে। তারপর আস্তে আস্তে হাতে চেপে দুধ বের করে দিন।

শেষে আবার একবার বলি,

প্রথম ছ-মাসে শুধু এবং শুধুই বুকের দুধ। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনোই বাইরের দুধ নয়। বাইরের দুধ দিতে হলে অন্তত তিনশো বার ভাবুন।

লেখাটা পড়ে যদি একজনেরও উপকার হয় তাহলে এই স্বাস্থ্য-শ্রমিকের লেখা সার্থক। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

টুকরো খবর

উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে নবজাতকের মৃত্যুর হার সাব-সাহারান আফ্রিকার থেকেও বেশি?

নবজাতক অর্থাৎ এক মাসের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর হারে সাব-সাহারান আফ্রিকার দ্বিগুণ উত্তর প্রদেশের হার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় এমনটাই দেখা যাচ্ছে। [সাব-সাহারান আফ্রিকাকে বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চল বলে ভাবা হয়।]

ল্যান্সেট গ্লোবাল হেলথ নামক জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ৮টি দেশের ১১টি স্থানের ২ লক্ষ ৮০ হাজার গর্ভবতী মাকে পুরো গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের পর আরও ৪২ দিন নজরে রেখে নবজাতকের মৃত্যুর হার, মৃত শিশু জন্মের হার এবং মায়ের মৃত্যুর হার দেখা হয়েছে।

দেখা গেছে যেখানে উত্তর প্রদেশে নবজাতকের মৃত্যুর হার ১০০০ জীবিত শিশুজন্ম পিছু ৪১, সেখানে সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলিতে এই হার ১০০০-এ ২০। দেশের সরকারের কিন্তু দাবি যে উত্তরপ্রদেশে নবজাতকের মৃত্যুর হার ১০০০-এ ২৭।

উত্তর প্রদেশে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রতি বছর স্বাস্থ্যখাতে ৫০০০ কোটি টাকা খরচ করে, যার ৩০-৩৫% খরচ হয় জনন-স্বাস্থ্য ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য।

হরিয়ানায় নবজাতকের মৃত্যুর হার দেখা গেছে ১০০০-এ ৪০।

অন্য দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশে ১০০০ নবজাতকের মধ্যে ৩৭.৮ জন এক মাসের কম বয়সে মারা যায়।

পাকিস্তানের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, মাটিয়ারি ও করাচিতে নবজাতকের মৃত্যুর হার যথাক্রমে ১০০০ জীবিত শিশুজন্ম পিছু ৪৬.৯ এবং ৫০.১। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্তন্যদানের রাজনীতি, স্তন্যদানের অধিকার

শতাব্দী দাশ

প্রসঙ্গ: সাউথ সিটি

ঘটনাটি কম-বেশি সবার জানা। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থানা সন্নিকটস্থ সাউথ সিটি মল। মহার্ঘ সব বিপণি, মাল্টিপ্লেক্স, ফুড কোর্ট ইত্যাদির সমাহার সেখানে। বেহালার অভিলাষা দাস অধিকারী তাঁর সাত মাসের কন্যাসন্তানকে স্তন্যদান করতে গিয়ে সেখানে প্রতিরোধের মুখে পড়েন। প্রকাশ্যে শিশুকে স্তন্যপান করাতে গেলে মলের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে বারণ করেন। তাঁকে নোংরা টয়লেটে গিয়ে স্তন্যপান করানোর পরামর্শ দেন তাঁদের কেউ কেউ। অভিলাষার বক্তব্য অনুসারে, নিরাপত্তাকর্মী ও সাফাইকর্মী ছাড়াও, তিনি বিভিন্ন বিপণির কর্মচারীদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানান। শিশুকে স্তন্যপান করানোর একটু জায়গা দিতে অস্বীকার করেন সকলেই। তিনি ওয়াশ-রুমেও যান নিরাপত্তারক্ষীর পরামর্শ মতো। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ শিশুর পক্ষে বড়ো স্বাস্থ্যকর মনে হয় না তাঁর। সাফাইকর্মীরাই নাকি তাঁকে জানান যে এই মলে কোনো বেবি-কেয়ার রুম নেই। মলের বিভিন্ন তলায় অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষপর্যন্ত মোটামুটি ফাঁকা এক পোশাক-বিপণীর কর্মচারী তাঁদের ট্রায়াল-রুমটি অভিলাষাকে ব্যবহার করতে দেন। হতাশ অভিলাষা ফিরে এসে তাঁর অভিজ্ঞতা দু-এক লাইনে লেখেন সাউথ সিটির ফেসবুক পেজের রিভিউ সেকশনে: "There is no place to breast feed . . . on top of it, your staff asked me to feed in the toilet . . . disgusting place . . . ."

সাউথ সিটি মল-এর অ্যাকাউন্ট হ্যান্ডলার এরপর রূঢ় এক জবাব দিলেন ফেসবুক পেজেই: "Funny you found it to be an issue because breast-feeding is not allowed on the floor for a number of reasons . . . with all due respect madam please make sure you do your home chores at your home and not in the mall, at least plan it beforehand. It's not like your baby needs to be breast-fed at any moment so you need arrangements to be made for you at any public area to breast-feed your child anywhere you wish to? We cannot compromise the privacy of other people in public places can we?"

অর্থাৎ, 'একাধিক কারণে' জনসমক্ষে বাচ্চাকে স্তন্যপান করানোর মতো 'ঘরের কাজ' (home chores) করা বারণ এই মলে। মল-কর্তৃপক্ষ কাস্টমারদের 'প্রাইভেসি' নিয়ে আপোশ করতে নারাজ, তাও জানা গেল। ক্ষুব্ধ অভিলাষা এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের কথা লেখেন এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বিষয়টি ভাইরাল হয়ে যায়। সাউথ সিটি মলের বাইরে পরদিন কিছু বিক্ষোভ-সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা হয় আরও বেশি। মলের অমানবিক আচরণের গল্প আগুনের মতো ছড়ানোর মুহূর্তে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন মল-কর্তৃপক্ষ। মলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনমোহন বাগরি জানান, ফেসবুক-পেজের ওই জবাব তাঁদের অনুমতি ছাড়াই লিখিত। যে এজেন্সিকে তাঁরা এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে নিরাপত্তারক্ষী অভিলাষাকে প্রকাশ্যে স্তন্যপান করাতে বারণ করেছিলেন, তাঁকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে সাউথ সিটি মলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। তাঁরা ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতিও দিলেন ফেসবুক পেজে: "We at South City deeply apologise unconditionally for the reply to your feedback. We are deeply saddened by the reply made by our account handler." আরও লেখা হল, মলটির পুনর্নির্মাণ চলছে বলে সব ঘর খোলা নেই, কিন্তু বাচ্চার পরিচর্যার জন্য ঘর তাঁদের নাকি চিরকালই ছিল (যদিও সাফাই-কর্মীরা অভিলাষাকে উলটো কথাই বলেছিলেন)। আগে থাকুক না থাকুক, সোশ্যাল মিডিয়া সরগরম হওয়ার পর থেকে জরুরি ভিত্তিতে সাউথ সিটি মল 'বেবিকেয়ার রুম' নামক পরিষেবা চালু করে।

ব্যক্তিগত না রাজনৈতিক?

কৃষক মার্চ বা সাম্প্রদায়িক রথযাত্রা নিয়ে জাতীয় ডামাডোলের বাজারে আমরা কি উপরের বিষয়টিকে মল-কর্তৃপক্ষের মতোই একটি 'প্রাইভেট' বা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে 'পাবলিক' ক্ষেত্রে অযথা শোরগোল ফেলার চেষ্টা হিসেবে দেখব? অনেকেই তেমন ভাবেন। এমনকী ক্ষুধার্ত শিশু ও তার মায়ের প্রতি সমবেদনা ও সমর্থনও মূলত ব্যক্তিগত আবেগ-নির্ভর। আবেগকে অস্বীকার না করেও, এ-কথা না বলে উপায় নেই যে ব্রেস্ট-ফিডিং একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ও বটে। ফেমিনিস্ট থিয়োরিতে বহু আগেই বলা হয়েছে 'ব্যক্তিগতও রাজনৈতিক' (The personal is political)। জানিয়ে রাখা ভালো, ইউরোপ এবং বিশেষত আমেরিকা ব্রেস্ট-ফিডিং-এর অধিকার নিয়ে অনেক আন্দোলন দেখেছে। অভিনেত্রী মিলা কুনিস কিছু দিন আগে বলেছেন, এগারো বছর আগে প্লেনে

ভ্রমণকালে বাচ্চাকে স্তন্যদান করানোর উদ্যোগ নিতেই এয়ারহোস্টেস তাঁকে রেস্টরুমে চলে যেতে বলেন। তিনি সেই পরামর্শ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সেলিব্রিটি হওয়ায় যত সহজে এই প্রত্যাখ্যান মেনে নেওয়া হয়েছিল, অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি ততটা সহজ কখনোই ছিল না। আজ যে অস্ট্রেলিয়ার সেনেটর বা কানাডার পার্লামেন্টেরিয়ান প্রকাশ্য পার্লামেন্টে শিশুকে স্তন্যপান করান, তা বেশ দীর্ঘ লড়াই-এর ফল। (কর্তব্যরত মায়েদের এই কর্মস্থলে স্তন্যদানের জনপ্রিয় ও ভাইরাল ইমেজেরও অবশ্য দ্বিমুখী অভিঘাত আছে। সে বিষয়ে পরে আলোকপাত করা যাবে।)

‘এক্সক্লুসিভ’ স্তন্যদান নিয়ে দু-এক কথা

বর্তমান দশকে মোটামুটি তাত্ত্বিকভাবে সকলেই এ-কথা জানেন ও মানেন যে মাতৃদুগ্ধই শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য শ্রেষ্ঠ। হু (WHO) ও ইউনিসেফ (UNICEF)-এর সুপারিশ হল, শিশুকে জল বা অন্য কোনো খাবার ছাড়াই মাতৃদুগ্ধ পান করাতে হবে তার ছ-মাস বয়স পর্যন্ত, যাকে ‘এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট-ফিডিং তত্ত্ব’ বলা হয়। তারপরেও, শিশুর দু-বছর বয়স পর্যন্ত অন্যান্য প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন খাবারের সাথে সাথে মাতৃদুগ্ধও পান করানো ভালো। হু আরও বলে, ব্রেস্ট-ফিডিং শুরু করতে হবে জন্মের পর যত শীঘ্র সম্ভব। স্তন্যদান চালিয়ে যেতে হবে ‘অন ডিমান্ড’, অর্থাৎ যখন যখন শিশু চাইবে। সাধারণত দেখা যায় প্রতি দু-ঘণ্টায় একবার দুগ্ধপানে শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। এইসব নিদানের কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্য ধনতান্ত্রিক নিক্তিতে বিনামূল্যের একটি পুষ্টি-উৎস। বরং কারণ হল, শিশুর দৈহিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে মায়ের দুধের অমিত ইতিবাচক ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞান আমার বিষয় নয়, সুতরাং এর গুগল-নির্ভর বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেয়ে বরং হু-এর বক্তব্যই হুবহু তুলে দেব:

“Breast milk promotes sensory and cognitive development, and protects the infant against infectious and chronic diseases. Exclusive breastfeeding reduces infant mortality due to common childhood illnesses such as diarrhoea or pneumonia, and helps for a quicker recovery during illness.”

ব্রেস্ট-ফিডিং-এর মাধ্যমে মা-শিশুর সম্পর্ক দৃঢ় হয়, শিশু খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়, শিশুর বেশি খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা কম থাকে, সে তার খাবারের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে—এসবও বলে থাকেন চিকিৎসকরা। উপরিউক্ত বক্তব্যে অবশ্যই শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা হু-এর চিন্তার কেন্দ্রে রয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র শিশুর উপকার নিয়েই তার মাথাব্যথা, এমনটাও নয়। বক্তব্যের পরবর্তী অংশ হল:

“Breastfeeding contributes to the health and well-being of mothers; it helps to space children, reduces the risk of ovarian cancer and breast cancer, increases family and national resources, is a secure way of feeding and is safe for the environment.”

অর্থাৎ মায়ের স্বাস্থ্যর বিষয়েও স্তন্যদানের ভূমিকা ইতিবাচকই। এর সঙ্গে মায়েদের ‘মোটিভেট’ করার জন্য চিকিৎসকরা আজকাল প্রেগন্যান্সি-ওয়েট সহজে ঝরানোর উপায় হিসেবেও স্তন্যদানের কথা প্রচার করেন। আরও লক্ষণীয়, শেষ দু-টি পয়েন্ট সরাসরি রাষ্ট্রীয় ও পারিবারিক (রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক) সম্পদ তথা পরিবেশ কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং নানা কারণেই স্তন্যদান একটি শুধুমাত্র ‘হোম চোরস’ নয়।

কিছু কিছু শারীরিক অসুবিধে থাকলে অবশ্য প্রতুল স্তন্যদান করতে মা অপারগ হন। ধরা যাক মায়ের হাইপোপ্লাস্টিক ব্রেস্ট আছে বা তিনি হাইপোথাইরয়েডিজমে ভুগছেন, বা ধরা যাক তাঁর বুকে কোনো প্রয়োজনীয় সার্জারি হয়েছে, ধরা যাক তাঁর ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে, ধরা যাক মা দীর্ঘকাল ধরে ক্ষতিকর ড্রাগে আসক্ত, ধরা যাক পলিসিস্টিক ওভারির কারণে মায়ের দুধ কম উৎপন্ন হচ্ছে . . . এরকম নানা কারণে মা অপারগ হলে কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসক হয়তো বুকের দুধ-এর সঙ্গেই অন্য খাবার দিতে বলবেন, কিছু ক্ষেত্রে পাম্প করে বুকের দুধ বের করার পরামর্শ দেবেন, কিছু ক্ষেত্রে শিশু বুকের দুধ থেকে একেবারেই বঞ্চিত হবে। কিছু ওষুধ গ্রহণকালে স্তন্যদান করা যায় না, আবার অনেক চিকিৎসকই স্তন্যদানকালে একইভাবে কার্যকরী বিকল্প ওষুধের ব্যবস্থা করেন। কেমোথেরাপির সময় বা ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপে পড়লে স্তন্যদান করানো যায় না। এসব ক্ষেত্রে মায়ের অপারগতা নিয়ে তাঁকে হেয় করা, তাঁর মাতৃত্বের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবশ্যই অনুচিত। কিন্তু এছাড়া বাকি ক্ষেত্রগুলিতে? ঘটনা হল, ৯০ শতাংশেরও বেশি মা নিজের সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারটুকুর জোগান দিতে সক্ষম এবং ৯০ শতাংশেরও বেশি শিশুর সাকিং প্রবলেম থাকে না।

স্তন্যদান নিয়ে বহুমাত্রিক রাজনীতি ও তার বিবর্তন

শিশুকে দুধ খাওয়ানো প্রত্যেক মায়ের ‘অধিকার’, প্রো-ব্রেস্ট ফেমিনিজমের মতে। প্রকৃতপক্ষে, বুকের দুধ খাওয়ানো নিয়ে সংকোচের বাহুল্যও আমাদের সংস্কৃতিতে ছিল না। এখনও আমাদের দেশে গ্রাম্য মহিলারা শাড়ি-টাড়ি দিয়ে আড়াল করে নির্দ্বিধায় দুধ খাওয়ান। সাউথ সিটির মতো ভিক্টোরীয় সেন্স অফ ডিসেন্সি একটি ঔপনিবেশিক আমদানি, যা আমরা এখনও ছাড়তে পারিনি, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি ছাড়ব তত মঙ্গল। ইউরোপে যে সময়ে নারী-শরীরকে কম করে সাত-আটটি পরতে ঢেকে, বেঁধে-ছেঁদে জোর করে আওয়ার-গ্লাসের রূপ দেওয়া হত, সেই সময়ে ব্রেস্টফিডিং-এর দৃশ্য খুব দৃষ্টিসুখকর ছিল না পিতৃতান্ত্রিক চোখে, তা বলাবাহুল্য। নারীর বক্ষ

শুধুমাত্র একটি যৌন-উদ্দীপক বস্তু ছিল 'মেল গেজ' বা 'পুংদৃষ্টি' অনুসারে। তার যত্রতত্র উন্মোচন ছিল লজ্জার বিষয়। কিন্তু যে পশ্চিম থেকে এইসব সৌন্দর্যবোধ, শালীনতাবোধ ও নীতিবোধ এসেছে আমাদের দেশে, সেখানে মহিলারা শুধু নির্দিষ্ট বুথে নয়, প্রয়োজনে যত্রতত্র দুধ খাওয়ানোর দাবি তুলছেন বহু দিন যাবৎ।

শুধুমাত্র ভিক্টোরীয় নীতিবোধ নয়, ব্রেস্ট-ফিডিং-বিরোধী সংস্কৃতির আরও কিছু দিক আছে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, পশ্চিমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেয়েরা যত বেশি বাইরে বেরোতে লাগল, ততই জনপ্রিয় হতে লাগল ফর্মুলা মিল্ক। সত্তরের দশকের আগে পর্যন্ত স্তন্যদানের হার ক্রমশই কমল। এর ফলে পশ্চিম দুনিয়ায় যেটুকু স্বাভাবিক স্বীকৃতি ছিল স্তন্যদানের, সেটুকুও হারিয়ে গেল। প্রশ্ন উঠল, স্তন্যদান কি একপ্রকার বাধ্যবাধকতা? নাকি তা একটি চয়েজ? নারীকে নিজ শরীরের উপর অধিকার কায়েম করতে দেওয়ার নারীবাদী দাবি থেকেই বলা হল, মায়েরই স্বাধীনতা থাকুক তিনি নিজের শরীর নিংড়ে দুধ খাওয়াবেন কিনা তা স্থির করার।

কিন্তু স্বাধীনতা বা চয়েজের প্রশ্নটি বোধ করি এত সরল নয়। এর পূর্ববর্তী আরেকটি ন্যায্য নারীবাদী দাবি ছিল: মা হওয়া যেন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক না হয়। এমনকী, 'সভ্যতা থমকে যাবে' এই অজুহাতেও কোনো সভ্য দেশে কাউকে মা হতে বাধ্য করা যায় না। তাই অনেক নারীবাদী ধারাতেই সরাসরি মাতৃত্বের বিরোধিতা আছে। কিঞ্চিৎ নমনীয় ধারায় বলা হয়েছে, মাতৃত্ব একটি 'চয়েজ' হোক। নারীর অধিকার থাকুক মা হওয়া ও না-হওয়ার মধ্যে একটি পথ বেছে নেওয়ার। এই পর্যন্ত তেমন কোনো গরমিল নেই। প্রশ্ন হল, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে স্তন্যদানকে 'integral part of reproductive process' বলছে, তাকে প্রজনন নামক সামগ্রিক প্রক্রিয়ারই একটি অংশ ধরব, এবং স্তন্যদানে আপত্তি থাকলে সামগ্রিকভাবে মাতৃত্বেও আপত্তি জানাব, নাকি প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশ নেব, অথচ তার কিছু কিছু অংশ বাদ দেব? তা নিয়ে বিতর্ক থাকবে।

যাইহোক, সুযোগ বুঝে এই বিবর্তন ও বিতর্ককে ঘিরেই গড়ে উঠল একটি ক্যাপিটালিস্ট ব্যাবসা। একটি বই আছে *পলিটিক্স অব ব্রেস্টফিডিং* নামে, যার সাব-টাইটেল হল 'হোয়েন ব্রেস্টস আর ব্যাড ফর বিজনেস'। এ-কথা সত্যি যে নানাভাবে মাতৃদুগ্ধ ব্যাবসার ক্ষতি করে। সাপ্লিমেন্ট বেবি ফুড দুনিয়া জুড়ে একটি বৃহৎ ব্যাবসা যা টিকেই আছে প্রায় অকারণে, কিছু ভুল ধারণা, কিছু মস্তিষ্ক-প্রক্ষালনের উপর ভিত্তি করে। ক্যাপিটালিজমের এমনই সর্বগ্রাসী ক্ষমতা যে তা ফেমিনিজমকেও একসময় সুচতুরভাবে ব্যবহার করেছে এই উদ্দেশ্যে। নিজের শরীরের উপর নিজের অধিকার কায়েম করতে 'সচেতন' মায়েরা ফর্মুলা-ফিডিং করতে থাকলেন। ক্রমে বিকল্প-দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চিকিৎসাক্ষেত্রেরও যোগাযোগ বাড়ল। ডাক্তাররাও এইসময় ফর্মুলা-ফিডিং-এর পরামর্শ দিতেন। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে স্তন্যদানের হার সংকটজনকভাবে কমে গেল, বাড়ল শিশু মৃত্যুর হার।

অন্যদিকে অ-নারীবাদী মায়েদের প্রভাবিত করা হল খানিক অন্য পন্থায়। কখনো তাঁদের মনে পারিবারিক ক্ষেত্রে মা-শাশুড়িরা, কখনো আবার চিকিৎসকেরা এমনভাবে দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা ও বাচ্চার স্বাস্থ্য নিয়ে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন যে তাঁরা বিশ্বাস করতে থাকেন, ব্রেস্ট-ফিডিং যথেষ্ট নয়। এখনও মাঝে মাঝেই শোনা যায়, বাচ্চা কাঁদছে মানেই তার পেট ভরছে না, তার ফর্মুলা দুধ প্রয়োজন . . . বাচ্চার জন্ডিস হয়েছে, সুতরাং তাকে ফর্মুলা-ফিডিং করাও—এরকম নানা পরামর্শ। পারিবারিক স্বজনরা নিজেরাও জানেন না যে তাঁরা বিজ্ঞাপন-জ্ঞানে ধৌত হয়ে ক্যাপিটালিজমের এজেন্ট হিসেবেই কাজ করছেন ও বাচ্চার ক্ষতি করছেন। আমাদের দেশে চা বানানো হয় যে আমুল স্প্রে দিয়ে, তার প্যাকেটের গায়েও বাচ্চার ছবি থাকত। অনেক গরিব মহিলাই সবচেয়ে সস্তা বেবিফুড হিসেবে এটিই খাওয়াতেন এবং বাচ্চার পেটের অসুখ নিশ্চিত করতেন। মায়ের হীনম্মন্যতা ও ট্রমার কথা ছেড়েই দিলাম। ব্রেস্টফিড করিয়েছেন এরকম মায়েদের মধ্যে এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর , যিনি 'বাচ্চা অভুক্ত থাকছে, যথেষ্ট সাপ্লাই দিতে পারছি না' এই ট্রমায় ভোগেননি, নানা শুভাকাঙ্ক্ষী যাঁকে বাচ্চার ভালো চেয়েই ফর্মুলা-ফিড করানোর পরামর্শ দেননি।

ক্রমে এই চিন্তাধারাও পালটাল। মানুষ যেহেতু শুধুমাত্র জৈবিক কারণে তাড়িত হয় না, যেহেতু মানুষের সিদ্ধান্ত তার দর্শন ও উপলব্ধি সঞ্জাত, সেই হেতু 'অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী স্তন্যদান করে', শুধুমাত্র এই যুক্তি নিয়ে মানবীকে স্তন্যদানে অনুপ্রাণিত করা খানিক সমস্যাজনক। ইতিহাসের নানা ধাপে নানা সামাজিক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা নারীর ব্রেস্ট-ফিডিং-এর সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সুতরাং মানবীকে স্তন্যদানে উৎসাহিত করতে হলে আবেদন রাখতে হয় তার মনন ও ধী-র প্রতি। সমাজ ও রাষ্ট্র স্তন্যদানকে কতটা গুরুত্ব ও মর্যাদা দিচ্ছে, নারী স্তন্যদানকালে কতটা সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, তার উপরেও নির্ভর করে তার সিদ্ধান্ত। প্রাকৃতিক হলেও, সুতরাং, মনুষ্য সমাজে স্তন্যদান একটি লার্নেড বিহেভিয়ারও বটে।

সে-কারণেই আশি ও নব্বই দশকে হু ও ইউনিসেফ শিশু কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্তন্যদান নিয়ে ইতিবাচক প্রচারে তৎপর হয়। ফেমিনিজম এই পর্যায়ে এসে স্তন্যদানকে সমর্থনই করল। যা এতদিন ধরে কখনো একটি 'বাধ্যবাধকতা', কখনো একটি 'চয়েজ' বলে প্রচারিত হচ্ছিল, তাকে 'মায়ের অধিকার' বলে ঘোষণা করা হল। ১৯৮৯ সালে পেনি ভ্যান এস্টেরিক বললেন যে স্তন্যদানও একটি "ফেমিনিস্ট ইস্যু" কারণ তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত মায়ের অধিকার, তাঁর স্বাস্থ্য, শিশুর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা। তিনি আরও বলেন, মা স্তন্যদানকালে একজন উপভোক্তা নয়, বরং একজন উৎপাদকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। শুধুমাত্র

যৌনবস্তু হিসেবে নিজেকে না দেখে স্বীয় ক্ষমতায় আরেকটি প্রাণ প্রতিপালন করেন। তাঁর মতো প্রো-ব্রেস্ট নারীবাদীরা দাবি করেন, স্তন্যদানের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করছে নারী, যা শুধুমাত্র নারীর পক্ষেই করা সম্ভব। সুতরাং তাকে উৎসাহ দেওয়া, তার এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য।

অন্যদিকে হু ও ইউনিসেফ ১৯৯২ সালে একটি শিশুবান্ধব-মাতৃ-অভ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম আয়োজন করে। প্রতি আগস্ট মাসে শুরু হয় স্তন্যদান দিবস ও সপ্তাহ পালন। চল্লিশ ঘণ্টার এক ব্রেস্ট-ফিডিং কাউন্সেলিং সেশনেরও আয়োজন করা হয় ওই বছর।

এককালে পিতৃতান্ত্রিক মা-মাসিরা বলতেন 'ফিগার খারাপ হওয়ার ভয়ে' মায়েরা শিশুকে দুধ খাওয়ান না। লক্ষণীয়, বর্তমানে কিন্তু চিকিৎসক বা ব্রেস্ট-ফিডিং-সমর্থকরা 'ফিগার' বা অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতি যত্নশীল হওয়াকে অ-মাতৃসুলভ ইচ্ছা ধরছেন না। বরং বলছেন, স্তন্যদানও হতে পারে প্রেগন্যান্সি-কালের অতিরিক্ত মেদ ঝরানোর একটা উপায়। অর্থাৎ, ভাষ্য বদলাচ্ছেন এমনভাবে যাতে নিজের শরীর ও শরীরের সৌন্দর্যর উপর নারীর অধিকারও প্রতিষ্ঠা হয়, আবার তিনি স্তন্যদান করতেও উৎসাহিত হন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রয়োজনও নেই যে প্রজনন মায়ের পক্ষে শারীরিকভাবে কষ্টসাধ্য ও শ্রমসাধ্য একটি প্রক্রিয়া এবং তার অব্যবহিত পরেই স্তন্যদান করাটা 'প্রাকৃতিক' হলেও তার কারণে মায়ের কষ্ট বাড়ে, বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে। একমাত্র আহারের সংস্থান হিসেবে 'অন ডিমান্ড' শিশুকে দুধ দিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। ধনতান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় এই শ্রম অবৈতনিক, সুতরাং গুরুত্বহীন। অ্যান্টি-ব্রেস্ট ফেমিনিস্টরা এই শোষণের দিকটি ন্যায্য কারণেই আলোচনা করতেন। বলতেন, ব্রেস্ট-ফিডিং-এ বাধ্য করা মেয়েদের আবারও ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার একটি চক্রান্ত।

নব্বই-এর দশক থেকে প্রো-ব্রেস্ট ফেমিনিস্টরা কিন্তু বললেন, রাষ্ট্রকেই নিজের গঠনতন্ত্র বদলে ফেলতে হবে। সমাজকে হতে হবে এমনভাবে বিন্যস্ত, কর্মজগতকে এমনভাবে নিজেকে গড়েপিটে নিতে হবে, যাতে নারী তার স্তন্যদানের অধিকার বজায় রাখতে পারে, আবার বহির্জগতের কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে পারে। এইসব দাবি মেনেই কিন্তু দেশে দেশে এল দীর্ঘতর মেটারনিটি লিভ, এল চাইল্ড কেয়ার লিভও। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। প্রথমে তিন মাস, তারপর সাড়ে চার মাস, তারপর ছ-মাসের মেটারনিটি লিভ-এই বিবর্তন আমরা দেখেছি দুই দশকের মধ্যেই। এখন দু-বছরের শিশু প্রতিপালন ছুটিও মিলেছে। আরও অধিকার দাবি করতে হবে, করাই উচিত মায়ের স্বার্থে।

আবার বিশ্বের ধনীতম দেশ ইউনাইটেড স্টেটসে সাত থেকে পনেরো দিনের বেশি মাতৃত্বকালীন ছুটি আজও পাওয়া যায় না। ধনতান্ত্রিক মস্তিষ্ক প্রক্ষালন এই অধিকারের দাবিকে থিতিয়ে দেয়। তার জন্য পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নারীর মাল্টিটাস্কিং-এর ক্ষমতার জয়গান করা হয়, শুধু বহিরঙ্গে থাকে উওমেন এমপাওয়ারমেন্টের একটি মুখোশ। সন্তান প্রসব করার কয়েকদিনের মধ্যেই ফেসবুকের মতো একটি বহুজাতিক সংস্থা চালাচ্ছেন মহিলা সিইও,পার্লামেন্ট অ্যাটেন্ড করছেন পার্লামেন্টেরিয়ানরা—এসব ঘটনাকে আমাদের সামনে মডেল হিসেবে উপস্থিত করা হয়। প্রশ্ন হল, জন্মদানের ঠিক পরেই স্তন্যদান করতে বললে যতটা লঘু করা হয় মায়ের প্রসবকালীন কষ্টকে, তার চেয়েও বেশি লঘু করা হয় না কি মায়ের কষ্ট ও শিশুর প্রয়োজনকে, ক্যাপিটালিস্ট দাবি মেনে জন্মদানের পরে-পরেই মাকে কাজে টেনে আনলে?

আগেই বলেছিলাম, পার্লামেন্টেরিয়ান যখন পার্লামেন্টে বসে স্তন্যদান করেন, তখন সেই ছবির অভিঘাত দ্বিমুখী। এক দিকে তা স্তন্যদানে উৎসাহ প্রদান করে, অন্যদিকে মাতৃত্বকে উপস্থাপিত করে এমনভাবে, যেন তা কতই সহজ! যেন মায়ের স্তন্যদানের জন্য ছুটি প্রয়োজন নেই, যেন তার নিজের শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন নেই, যেন সাত-তাড়াতাড়ি কাজে ফেরাই একজন মায়ের মোক্ষ। একজন পার্লামেন্টেরিয়ানের পক্ষে তা হয়তো অসম্ভব কিছু নয়, রাষ্ট্র তাঁকে বিবিধ সুযোগসুবিধা এমনিতেই দেয়। ফেসবুকের কর্ণধারের মতো ধনী মালিক শ্রেণির মহিলার পক্ষেও সাতদিনের মাতৃত্ব-ছুটির পর কাজে যোগ দেওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু যে মহিলা সাধারণ কর্মচারী হিসেবে বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে, তার কাছে এই মডেল হাজির করা হলে সেই মডেল মালিকের হাতে নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হবে। এ ধরনের প্রচারের প্রথম শিক্ষাটুকুই সুতরাং গ্রহণ করা ভালো। মাল্টিটাস্কিং-এর মহিমা প্রচারের অংশটি ক্যাপিটালিস্ট শোষণের অংশ কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

মার্কসীয় নারীবাদ, রিপ্রোডাক্টিভ লেবার ও স্তন্যদানের ব্যাখ্যা

কেন শিশু-পরিচর্যা বা স্তন্যদানের যথাযোগ্য মর্যাদার জন্য আজও লড়তে হয়? তা বুঝতে আমাদের কিছুটা এঙ্গেলসের *অরিজিন অব ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট*-এ ফিরতে হবে, কিছুক্ষেত্রে মার্কসিস্ট ফেমিনিস্টদের দ্বারস্থ হতে হবে। শিকারবৃত্তি থেকে কৃষিবৃত্তিতে একসময় মানুষের উত্তরণ ঘটেছে, শ্রমের বিভাজন হয়েছে কায়িক ক্ষমতার ভিত্তিতে। কিন্তু কেউ গৃহকার্যে শ্রমদান করছে না বহির্জগতে শ্রমদান করছে—তার ভিত্তিতে সামাজিক মর্যাদার বাড়া-কমা হত না ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না উৎপাদন বৃদ্ধি পেল এবং মানুষের হাতে সারপ্লাস অর্থ, সম্পদ বা শস্য না জমতে শুরু করল। মানবীর হাতে

সেই সারপ্লাস কখনোই এল না। পুরুষ সারপ্লাস দখল করল, ভোগ্যপণ্য দখল করল, সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক হল। নারীর গৃহশ্রমকে এরপর ধীরে ধীরে 'প্রোডাক্টিভ' কাজের আওতায় আনা বন্ধ করা হল। ধনতন্ত্র প্রোডাকশন পরিমাপ করল স্থূলতর অর্থনৈতিক নিক্তিতে। কৃষক ফসল না ফলালে যে নাগরিক জীবনের রাজনীতি, অর্থনীতি স্রেফ জৈব জ্বালানির অভাবে স্থগিত হয়ে যেত, তা আমরা ভুলে যেতে বসেছিলাম বলেই দিল্লি আজ কৃষকের পদধ্বনিতে কেঁপে উঠছে। তেমনি নারী তথাকথিত 'নন-প্রোডাক্টিভ' গার্হস্থ্য শ্রম ও প্রজনন শ্রম না দিলে অন্য সকল ক্ষেত্রে মানুষ যে শ্রমদানের উপযুক্ত থাকত না, তা আমরা ভুলে যাই। তাই গৃহশ্রম এখনও নারীকে বেতন বা সম্মান কিছুই দিতে অপারগ। তাই প্রজনন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাজকে—তা সন্তান ধারণ হোক, দুগ্ধপান করানো হোক বা সন্তানের পরিচর্যাই হোক—এসবকে আমরা এখনও শ্রমের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারিনি।

পেগি মর্টন বা মার্গারেট বেল্টনের মতো মার্কসীয় ফেমিনিস্টরাই প্রথম লেইবার বা শ্রমকে দু-ভাগে বিভক্ত করেন, প্রোডাক্টিভ ও রিপ্রোডাক্টিভ লেবার। তাদের পারস্পরিক নির্ভরতার উপর জোর দেন তাঁরা। বলেন, রিপ্রোডাক্টিভ লেবারের সঙ্গে যুক্ত যাঁরা, তাঁরাও শ্রমিক, তাঁদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাও শ্রমিক-কল্যাণমুখী যেকোনো রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই রিপ্রোডাক্টিভ লেবার বলতে কিন্তু শুধু প্রজনন-সংক্রান্ত শ্রমকে সূচিত করছেন না তাঁরা। রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার রাখা, পরিবারের লোকজনের যত্ন—সবই

মাকে দুগ্ধদানে উৎসাহ দিতে গেলে তাঁর কর্মক্ষেত্রকে, তথা রাষ্ট্রকে, বুঝতে হবে যে স্তন্যদান একটি ফুল-টাইম কাজের সমান।

বোঝাচ্ছেন। কালক্রমে এক লিঙ্গশ্রেণি তাঁদের সমগ্র রিপ্রোডাক্টিভ লেবার অন্য লিঙ্গশ্রেণির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে—এমনই তাঁদের বক্তব্য। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন, হয় রিপ্রোডাক্টিভ বা পারিবারিক কাজ ভাগাভাগি করা, নয় সারাক্ষণের গৃহকর্মের জন্য বেতন কাঠামো। তেমনি আবার প্রয়োজন, যেসব কাজে শুধুমাত্র মেয়েরাই সক্ষম, সেগুলিকে তাদের প্রতিবন্ধকতা, দুর্বলতা বা কেরিয়ারে উন্নতির পথে অন্তরায় হিসেবে না দেখিয়ে, সেই কাজগুলির জন্যই তাদের যথাযোগ্য সম্মান, স্বীকৃতি ও সুযোগসুবিধা দেওয়া। শিশু প্রসব বা স্তন্যদান এইরকমই কিছু কাজ।

যা যা সংস্কার আশু প্রয়োজন

সুতরাং মাকে দুগ্ধদানে উৎসাহ দিতে গেলে তাঁর কর্মক্ষেত্রকে, তথা রাষ্ট্রকে, বুঝতে হবে যে স্তন্যদান একটি ফুল-টাইম কাজের সমান। প্রথম ছ-মাসের জন্য মেটারনিটি লিভ, তারপরও কিছু ওয়ার্ক ফ্রম হোম, কিছু ফ্লেক্সিলিভ, কিছু সহমর্মিতা দরকার মায়ের জন্য, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট-ফিডিং-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে। সেই সঙ্গে কর্মস্থলেই নার্সারি ও বেবিকেয়ার রুমের ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে মা প্রয়োজনে শিশুকে নিয়ে কাজে যেতে পারেন। পাবলিক ব্রেস্ট-ফিডিং নিয়ে ছুঁৎমার্গ বর্জন করে দুগ্ধপানরত শিশু বা স্তন্যদানরত মায়ের দৃশ্যে চোখে সইয়ে নেওয়াও দরকার।

ইউনাইটেড স্টেটসে কর্মরত মায়েদের কথা মাথায় রেখে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট এসেছিল, ১৯৩৮ সালের পুরোনো ফেয়ার লেবার অ্যাক্টকে সংশোধন করে। নিউ ইয়র্কে আছে ব্রেস্ট-ফিডিং মাদারস বিল অব রাইটস। ৪৯টি আমেরিকান স্টেটে ব্রেস্ট-ফিডিং-কে 'ইন্ডিসেন্সি চার্জ' থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জনসমক্ষে, রাস্তায়-ঘাটে স্তন্যদান এখনও আমেরিকার অনেক জায়গায় একটি ইস্যু (যে কারণে আইন করে কিছু স্টেট তাকে অশালীনতার দায় থেকে মুক্তি দিয়েছে)। অনেকেই এখনও স্তন্যদানের ঘটনা দেখলে আপত্তি জানান, বাচ্চাদের আড়াল করেন। অনেকেই একে মলমূত্র ত্যাগ বা যৌনতার মতোই একটি গোপন ও ব্যক্তিগত কাজ মনে করেন, যা 'টয়লেটে' করা যায়, বাসে-ট্রেনে-টিউবে নয়। 'পাবলিক ডিসপ্লে অব ব্রেস্ট-ফিডিং' তাই দুনিয়া জুড়েই একটি আন্দোলনের বিষয় ও লক্ষ্য। শিশুর খিদে ও সেই খাবারের সংস্থান করে দেওয়া নিয়ে আর রাখঢাক করতে রাজি নন মহিলারা। শুধুমাত্র অনভ্যস্ত চোখের অস্বস্তি এড়াতে নিজেকে অনাবৃত না করা, বাচ্চাকে অভুক্ত রাখাকে মানবিকতা ও নারীবাদী নীতি—উভয়েরই বিরোধী মনে করছেন তাঁরা।

আমাদের দেশে এধরনের আইন প্রয়োজন হয়নি, কারণ এখনও দেশের সর্বত্র স্তন্যদানরত মায়ের সঙ্গে সাউথ সিটির ঘটনার মতো দুর্ব্যবহার করা হয় না। মা হিসেবে আমি সত্যি শহর কলকাতায় কিছু হাসপাতাল বা পেডিয়াট্রিশিয়ানের চেম্বার ছাড়া কোথাও ফিডিংবুথ দেখিনি। আবার এটাও সত্যি যে শহর কলকাতায় রাস্তাঘাটে ব্রেস্ট-ফিডিং করাতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি। মহিলারা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, আড়ালও দিয়েছেন নিজেদের সংস্কার মতো। সুতরাং সাউথ সিটির বোধবুদ্ধি দেখে আমি শঙ্কিত। কিছুদিন আগেও দক্ষিণী এক ম্যাগাজিনে স্তন্যদানের ছবি কভারে ছিল বলে বিক্ষোভ, মামলা-মোকদ্দমা দেখলাম। প্রতি-আন্দোলনও দেখলাম। আমরা কি তবে পিছিয়ে যাচ্ছি? আরও বছর পঞ্চাশ আমরা ইউরোপীয় ট্যাবু মেনে চলব দেশজ সংস্কৃতি ভুলে? তারপর আবার ইউরোপীয় কায়দায় পাবলিক ব্রেস্ট-ফিডিং আন্দোলন করব? স্তন্যদানের অভ্যাস আমাদের দেশে যখন আগে থেকেই ছিল, তা নষ্ট করে ফেলা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় মনে হয়।

ভারতের মতো দেশে, সত্যি বলতে এশিয়া, আফ্রিকা ও আদি-অধিবাসী অধ্যুষিত দক্ষিণ আমেরিকার নানা জায়গাতেও জনসমক্ষে দুধ খাওয়ানো নিয়ে তেমন কোনো পিউরিটান সমস্যা ছিল না। সমস্যার রূপ সেসব জায়গায় ভিন্নতর। এসব মহাদেশে মায়েরা ভোগেন অপুষ্টিতে, রোগে। মাতৃত্বকালীন যত্ন থেকে তাঁরা অনেক বেশি বঞ্চিত। সুষম আহারের অভাবে এঁরা নিজেরাও অসুস্থ হয়ে পড়েন, শিশুকেও প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান দিতে পারেন না। কিন্তু তার সমাধানও ফর্মুলা দুধ নয়, সমাধান হল মা বা ভাবী মায়ের প্রতি পারিবারিক যত্ন, সামাজিক দায়িত্ববোধ।

আমাদের দেশে এধরনের আইন প্রয়োজন হয়নি, কারণ এখনও দেশের সর্বত্র স্তন্যদানরত মায়ের সঙ্গে সাউথ সিটির ঘটনার মতো দুর্ব্যবহার করা হয় না। এটাও সত্যি যে শহর কলকাতায় রাস্তাঘাটে ব্রেস্ট-ফিডিং করাতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি।

জনসমক্ষে স্তন্যদান না করতে দেওয়া, সুতরাং, কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটি পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে চলা একটি ব্যাবসায়িক ষড়যন্ত্র ও দার্শনিক দোলাচলের অংশ মাত্র। আমাদের দোলাচল যেন কোনো ষড়যন্ত্রকে দৃঢ় না করে, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাউথ সিটি-কর্তৃপক্ষর বক্তব্য যদি লক্ষ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, তাঁরা বলছেন, শিশুর যদি ঘন ঘন খিদে পায়, তাহলে মা কেন বিকল্প অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখেন না? কীরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট? ফর্মুলা-ফিডিং নিঃসন্দেহে। অর্থাৎ মা ব্রেস্টফিড করাতে আগ্রহী হলেও তাঁকে বাইরে বেরোলে অন্তত ফর্মুলা-ফিডিং করাতেই হবে। পাম্পিং মেশিন দিয়ে আগে দুধ বের করে রাখা আরেকটা উপায়। মা নিজে সঙ্গে থাকলে আর শিশুর সাকিং প্রবলেম না থাকলে সেই যন্ত্রটিও-বা কিনতে ও ব্যবহার করতে কেউ বাধ্য হবে কেন?

এ-কথা সত্যি যে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট-ফিডিং তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে চড়া দামে ইন্টারনেটে মাতৃদুগ্ধ বিক্রয় হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যার বিশুদ্ধতা নিয়ে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল। এ-কথাও সত্যি যে ব্রেস্ট-পাম্পিং মেশিনের ব্যাবসাও বেড়েছে হু-হু করে। এতদ্‌সত্ত্বেও এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট-ফিডিং-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দুধের শিশুর খাবারের সর্বোৎকৃষ্ট 'অ্যারেঞ্জমেন্ট' মা নিজে। তাই নারীবাদী স্লোগানেও এখন স্তন্যদানের অধিকারের দাবি থাকে। তা থেকে মুক্তির দাবি এখন অতীত। কিন্তু শিশু প্রসব ও স্তন্যদান নারীর শৃঙ্খল বা বোঝা হয়ে উঠবে না তখনই, যখন রাষ্ট্র এই কাজগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবে, সুযোগসুবিধা-ছুটি দেবে মায়ের প্রয়োজন মতো, যখন প্রকাশ্যে দুগ্ধপান করাতে গেলে মাকে রক্তচক্ষুর বা শেম-গেমের সম্মুখীন হতে হবে না। নারীর প্রতি দাক্ষিণ্য হিসেবে নয়, রাষ্ট্রের ও সমাজের এটুকু ব্যবস্থা করা উচিত স্রেফ মানবসভ্যতার অস্তিত্ব আরও কিছুদিন নিশ্চিত করতে।

এটুকু আশা, এটুকু দাবি খুবই বাস্তবসম্মত ও রাজনৈতিক।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

এই নিবন্ধটি ইন্টারনেটে ই-ম্যাগাজিন *চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম*-এ পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ও *চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম*-এর সম্পাদকমণ্ডলীর অনুমতিক্রমে এখানে পুনরায় প্রকাশিত হল।

লেখক একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

Advt.

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫৫ বছরের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে--রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে: পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০০০৯

ফোন-৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা

পর্ব আঠেরো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

‘ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে’ পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে,২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এরমধ্যে ডিসেম্বর ২০১৮-য় সাহিত্য সংসদ *ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা* নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এই সংখ্যা থেকে ওই গ্রন্থটি থেকে পুনর্মুদ্রণ আকারে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* ধারাবাহিকটি চলতে থাকবে—শেষ না হওয়া পর্যন্ত। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে জীবনকথা-র অনেক-আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

বাড়ির সকলে আমার ওই প্রায় জান্তব চিৎকারে জেগে উঠে আমাকে ডাকাডাকি করতে লাগল। আমার তখন কিছুমাত্র হুঁশ ছিল না। ওরা হাতে লণ্ঠন নিয়ে দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি তখন পুরোপুরি অচেতন; হাঁটু মুড়ে চোরটার বুকের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিলাম। ওরা টানাটানি করে আমার হাত থেকে গামছাটা ছাড়িয়ে নিতে চাইছিল। না পেরে শেষে একটা দা দিয়ে গামছাটা কেটে ফেলল। তারপর সকলে মিলে আমাকে বেদম পেটাতে লাগল। হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে সে কী এলোপাতাড়ি মার! আর ওদিকে চোরটার সেবায় লেগে পড়ল—কেউ জল দেয়, তো কেউ পাখার বাতাস করে! কী ভয়ংকর মারটাই না আমি খেয়েছিলাম সেদিন! আমার বুকে-পিঠে লাঠির ঘা, কিল-চড়-ঘুষির যেন বন্যা বয়ে যাচ্ছে। শেষে কেউ একজন আমার মাথায় লাঠি দিয়ে মারলে আমি পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ওরা আমাকে ফেলে রেখে চোরটাকে ধরাধরি করে ঘর থেকে নিয়ে চলে গেল।

আমার কিছুটা হুঁশ ফিরে এল। পড়ে রইলাম সেখানেই। কেউ এসে একবারের জন্যেও জানতে চাইল না—আমার কী অবস্থা। খানিক পরে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে তেড়ে জ্বর এল। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল। ‘জল জল’ করে চেঁচাচ্ছি, কারও কোনো সাড়া নেই। খানিক পরে বউটি এক ঘটি জল নিয়ে এল। সর্বাঙ্গ ব্যথায় টনটন করছে; হাত-পা নাড়াতে পারছি না, কোনোমতে মুখটা হাঁ করলাম। ও আমার মুখে ঘটি থেকে জল ঢেলে দিল। জল খেয়ে যেমন ছিলাম তেমনই শুয়ে রইলাম। বউটি আমার কপালে হাত দিয়ে বলল: ‘ইস! জ্বরে তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে।’ গোটা শরীর জুড়ে আমার দুঃসহ যন্ত্রণা। জিগেস করলাম: ‘বউদি, চোরটা কোথায়? সে কি পালিয়েছে?’ ও চুপ করে রইল। খানিক পরে বলল: ‘কেন? কী হয়েছে তোমার? ভুলভাল বকছ কেন? ঠিক বুঝেছি, জ্বরটা নিশ্চয়ই আরও বেড়ে গেছে।’ বললাম: ‘না, বউদি, আমি মোটেই প্রলাপ বকছি না। দেখতে পাচ্ছ না, ওরা আমাকে কীভাবে মেরেছে? এই দেখো, মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে।

না হয় আমার মাথার ঠিক নেই, আবোল-তাবোল বকছি, কিন্তু তাহলে মাথাটা ফাটল কী করে?' 'তুমি এসব স্বপ্ন দেখেছ। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলে, তাইতেই তোমার মাথা ফেটেছে।' আমার তখন শরীর-মনের যা দশা, এটা নিয়ে আর তক্কাতক্কি করতে মন চাইল না। ওইরকম জ্বরে প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থেকেও মাথা তুলে দরমা-বেড়ার গায়ে তখনও ফুটোটা আছে, দেখতে পেয়েছিলাম। সেবার জ্বরে আমি ভুগেছিলাম বারো দিন।

কখনো হুঁশ ফিরে পেতাম, কখনো-বা পড়ে থাকতাম বেহুঁশ হয়ে। একদিন আমি বিছানাতেই পায়খানা করে ফেলেছিলাম। নীচু জাতের খেরেস্তান এক মাঝবয়সি নারী এসে বিছানা সাফ করতে করতে আপন মনে বিড়বিড় করছিল: 'এই ঢলানি-ছেনাল মাগিটা মনে হয় আর বাঁচবে না।' আমি তখন কানে ভালো শুনতে পাচ্ছিলাম না আর ওই মেয়েটি বদ্ধ কালা—এতটাই যে বাজারের হইহট্টগোলও তার কানে ঢোকে না। সেজন্যে ওর সঙ্গে কেউ কথা বলতেও চায় না। আবছা আবছা শুনতে পেলাম, বাড়ির কর্তার নাকি ভারী অসুখ, তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় বাড়ির সকলের রাতের ঘুম উড়ে গেছে। বিছানাতেই শুয়ে থাকতাম। কখনো কখনো স্বর্ণর বউ দুধ-সাগু আর জল নিয়ে আসত। মাথার কাছেই একটা ঘটি রাখা ছিল। তা থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে মাথায় ছিটিয়ে দিতাম। নিজে নিজেই করতাম এসব। প্রায়ই বেহুঁশ হয়ে পড়তাম। কোনো ডাক্তার, কবিরাজ আমায় দেখতে আসেনি। দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছিলাম। জানি না, এই বারো দিনের ভেতর কে এসে দরমা বেড়ার ফুটোটা সারিয়ে দিয়ে গেছে। যেদিন আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, সেদিন ক্লান্তিতে আমি প্রায় আধমরা। কিছুক্ষণ পরে

'কী দস্যি মেয়ে রে বাবা! লোকটাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল। কে জানত ওই মাগিটা খুনখারাপির মতো এমন একটা কাজ করে ফেলবে। এখন তো লোকটা জীবন ও মৃত্যুর মাঝে খাবি খাচ্ছে।'

স্বর্ণর বউ এসে আমাকে মকরধ্বজ দিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এখন গা-হাত-পায়ে ব্যথা-বেদনা অনেক কম; শরীরটা বেশ হালকা ঝরঝরে লাগছে। সেদিন স্বর্ণর বউ আমাকে দুধ-সাগুর সঙ্গে পাতলা ডালের জলও খেতে দিলেন।

এই ক-দিনে আমি ঠাকমা বা স্বর্ণকমলবাবুকে তাঁদের ঘর থেকে বেরোতে দেখিনি। ওখানে একাই পড়ে থাকতাম, বউটি এসে আমার খাবার দিয়ে যেত। ওকে জিগেস করে জানতে পারলাম যে ওর কর্তা গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় ভারী চোট পেয়েছে। আমি একটু অবাক হলাম, ভাবলাম কথাটা মনে হয় বানানো। কিন্তু আমার কী বলার আছে? চুপ করেই রইলাম। মনের এই ধন্দটা ঘোচানোর জন্যে গায়ে যতটা জোর দরকার ততটা তখন আমার ছিল না। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম আমি বউদিকে যা বলেছি, আসলে সত্যি সত্যিই তা ঘটেছে। এটা যে সত্যি, তা আমার পেছনে কথা কানাকানি থেকে টের পেয়ে গিয়েছিলাম। ওরা বলত: 'কী দস্যি মেয়ে রে বাবা! লোকটাকে তো প্রায় মেরেই ফেলেছিল। কে জানত ওই মাগিটা খুনখারাপির মতো এমন একটা কাজ করে ফেলবে। এখন তো লোকটা জীবন ও মৃত্যুর

ভেতর ভেতর অশান্তি যে আমার মনে অনবরতই পাক খাচ্ছিল। এদের আশ্রয়ে আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না। সেটা হবে চরম বোকামি। আর ওরাও আমাকে কোনোমতেই যেতে দেবে না। আমাকে গোপনে পালাতে হবে।

মাঝে খাবি খাচ্ছে।' এটা শোনার পর আমি ভাবতে বসলাম—ওরা চাইছেটা কী? আমাকে কি মেরে ফেলবে? আর সেজন্যেই এতসব চালাকি! আমাকে বলে গেল: ভাবখানা এমন স্বর্ণ যেন ঢাকা চলে যাচ্ছে (মনে তো হয় বানানো কথা) আর আমাকে ফেলে রেখে গেল একা একটা ঘরে। আমাকে নিয়ে এসব কী ছলচাতুরি-ছিনিমিনি খেলা চলছে? মেরে ফেলবে বলেই কি মুনশিগঞ্জের এই জঙ্গলে ওরা আমাকে এনে ফেলল!

ভেতর ভেতর অশান্তি যে আমার মনে অনবরতই পাক খাচ্ছিল। এদের আশ্রয়ে আর এক মুহূর্তও থাকা চলবে না। সেটা হবে চরম বোকামি। আর ওরাও আমাকে কোনোমতেই যেতে দেবে না। আমাকে গোপনে পালাতে হবে। কিন্তু যাব যে, আমি তো নড়তে-চড়তেই পারি না। গায়ে নেই এক রত্তি বল। সারাক্ষণের দুশ্চিন্তা আমার—কোথায় যাব আর কীভাবেই-বা? আমার কপাল! বেনারসে তো বেশ ছিলাম। এই সব্বনাশটা তো নিজেই ডেকে আনলাম। এখন উপায়? কীভাবে পালাই এখান থেকে? একদিন চাকর কালীচরণ আমার এঁটো থালা-বাসন নিতে এল। আমি ওকে জিগেস করলাম: 'কালী, ওরা কি আমার ওপর খুব রেগে রয়েছে?' 'তোমায় আমি আর কী বলব, মা। এখানে তোমার আর থাকা চলে না। সব কথা তোমাকে বলা যাবে না, কেননা তাহলে ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে না।' আমি আরও কাহিল হয়ে পড়লাম, শরীরের শক্তি যেন সব ফুরিয়ে গেছে। কেন? ওদের আমি কী

করেছি? আমার পিছনে লেগে এত অত্যাচার-নির্যাতন কেন? দিনগুলো কেটে যায় এইসব ভাবনা ভেবে। ভাবতেই থাকি, ভাবতেই থাকি—কিন্তু অতল-রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারি না। কিছুদিন চুপচাপ রইলাম। একটু একটু করে গায়ে জোর ফিরে পেতে লাগলাম। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, কিছুতেই আর এখানে আর থাকব না।

এক রাতে উঠে আমার যা কিছু ছিল সেগুলো আমার শাড়ির আঁচলে বেঁধে নিয়ে বাড়িকে ঘিরে কাটা খালের (পরিখা) কাছে গেলাম। জলে নেমে খাল পেরিয়ে মাঠে উঠলাম। মাঠ বরাবর হেঁটে একটা গাঁয়ে গিয়ে পড়লাম। নিশুত রাত, কেউ আমায় খেয়াল করেনি। গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে পড়লাম গিয়ে একটা গঞ্জ মতো জায়গায়। ভোর ভোর ঘুম এসে গিয়েছিল। একটা ছাউনির তলায় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

এর মধ্যে একদল লোক আমার চারপাশে জড়ো হয়েছে। তাদের হাতে গাড়ু। ওরা আমার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছিল: 'এই ওঠো! ওঠো! তুমি কে?' কেউ কেউ বলল: 'মনে হচ্ছে কারও-না-কারও বউ বা মেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।' এইরকম সব কথাবার্তা বলে ওরা আমাকে জ্বালিয়ে মারছিল। একটা কথা ওরা ঠিকই বুঝেছিল: আমি একটি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। বারবার আমাকে জিগেস করছিল: 'বলছ না কেন, তুমি কে? কী তোমার পরিচয়?' আমি সাধ্যমতো ওদের বুঝিয়ে বললাম: আমার কোনো পরিবার নেই। কিছু লোকের আশ্রয়ে থাকতাম। ঠিক করেছি, ওদের বাড়িতে আর থাকব না, তাই চলে এসেছি। কিন্তু ওরা কেউ আমার একটা কথাও বিশ্বাস করল না। কী ঝামেলা রে বাবা! কেউ যদি মনে করে, সে তার ইচ্ছেখুশিমতো কোথাও যাবে—তাও সে পারবে না! লোকে তাকে কিছুতেই একা ছাড়বে না!

শেষমেশ ওরা পঞ্চায়েত-সভাপতিকে নিয়ে এল। তিনি এসেই চৌকিদারকে তলব করলেন এবং তাকে কোথাও একটা পাঠালেন। চৌকিদার গেল আর এল। বলল: 'নৌকো ঘাটে ভেড়ানো আছে।' আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, জিগেস করলাম: 'আমাকে আপনারা কোথায় পাঠাতে চাইছেন?' নির্বিকার মুখে ওরা বলল: 'তোমাকে থানায় পাঠাচ্ছি।' 'কেন? কী অপরাধটা করেছি যে আমাকে থানায় পাঠাচ্ছেন?' ওরা বলল: 'তুমি কার বউ বা মেয়ে, তা তো কিছুতেই বলতে চাওনি।' বললাম: 'যা সত্যি তাই বলেছি, আপনারা যদি বিশ্বাস না করেন তো আমি কী করব?' ওরা আমাকে এমনভাবে হুকুম করতে শুরু করল, যেন ওরাই আমার মনিব: 'এদিকে এসো, নৌকোয় ওঠো। এই চৌকিদারের সঙ্গে থানায় যাবে।' আমি ঘাড় বেঁকিয়ে বলে দিলাম: 'যাব না।' মুহূর্তেই ওদের ভয়াল-কুটিল-হিংস্র মুখগুলো দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বেরিয়ে পড়ল: 'যাবে না! তোমার ঘাড় যাবে। টেনে-হিঁচড়ে তোমায় থানায় পাঠাব।' শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেদিন এই জগৎ আর তার লোকজনের ওপর যে ঘেন্না আর অরুচি ধরে গিয়েছিল তা এখনও আমার মনে গেঁথে আছে।

অগত্যা ওদের কথামতো নৌকোয় চড়ে বসলাম। চৌকিদারকে ওরা হুমকি দিয়ে রাখল: 'অ্যাই! খবরদার! ওর ওপর কড়া নজর রাখবি। দেখিস, যেন পালাতে না পারে। ও পালালে তোর চাকরি যাবে। আর মনে রাখিস, ও কিন্তু বড়ো ঘরের মেয়ে। ওকে কোনো আজেবাজে খারাপ কথা বলবি না; তাহলে জরিমানা করে দেব।' চৌকিদার বেশ একটু ভয়ই পেয়ে গেল, জিগেস করল: 'কত্তা, ওঁর খাওয়া-দাওয়ার কী করব?' ও আমার খাওয়ার কথা তুলল কিন্তু নিজেরটা তুলল না। কিছুটা ভয়ে আর আমার খাওয়ার জোগাড় হলেই ওরও যে জুটে যাবে, সেটা ও জানত। সভাপতি ওকে একটা টাকা দিয়ে বললেন: 'ও যদি স্বপাক খেতে চায় তো ওকে কিছু চাল, ডাল কিনে দিস। ওতে তোরও কুলিয়ে যাবে। আর যদি ও রাঁধতে না চায়, তাহলে ওকে চিঁড়ে কিনে দিস আর থানায় পৌঁছে নৌকোর ভাড়া মিটিয়ে দিবি। ফিরে আসবি হেঁটে।' এই আদেশ-নির্দেশ নিয়ে চৌকিদার নৌকো ছেড়ে দিল। চুপচাপ বসেছিলাম। বিধাতার কাছে বারবার কপাল ঠুকে জানতে চাইছিলাম: 'হে ভগবান! আর কত যাতনা আমার জন্যে জমা করে রেখেছ তুমি?

> . . . এত কষ্ট যে পেতে হচ্ছে, তা কি আমি নারী বলেই? কেউ কি কোনো পুরুষকে এভাবে নির্মম শাস্তি দিতে পারবে? আমি কার বউ, কার মেয়ে—অত শত খোঁজে ওদের দরকারটা কী? না জানতে পারলে ওদের রাতের ঘুম উড়ে যায় কেন?

আমাকে নিয়ে এ কী খেলা খেলে চলেছ! হে ঈশ্বর! আমি যে আর সইতে পারছি না।' বসে রইলাম কাঠের মতো; চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে দরদর করে।

চৌকিদার বলল: 'আপনি কী খাবেন, মা?' বললাম: 'কিচ্ছু খাব না।' সে বলল: 'তা তো হবে না। আপনি বামুনের মেয়ে, আপনাকে তো আমরা উপোসে রাখতে পারি না। আমি পুববাংলার গেঁয়ো ভূত। না খেলে আমাদের চলে না। আমার সঙ্গে দু-জন মাঝিও আছে। আমরা সারাদিন না-খেয়ে থাকব কী করে?' 'দেখতে-না-দেখতে তোমরা পৌঁছে যাবে। ওখানে গিয়ে কোনো হোটেলে খেয়ে নেবে।' 'এটা কী বলছেন, মা? ওখানে সন্ধ্যার আগে আমরা পৌঁছোতেই পারব না। নদীপথে ছ-মাইল দূর; আর নৌকো চলেছে উজানে। উজানে নৌকো বাওয়া যে কী কঠিন তা আপনি ভাবতেও পারবেন না।' ভাবলাম, যা হওয়ার তা হবে। কার ঘাড়ে আর দোষ চাপাব? বললাম: 'আচ্ছা, ঠিক আছে। যাও, কিছু চাল, ডাল নিয়ে এসো।'

মাঝিদের একজন আশপাশ কোনো এক জায়গা থেকে চাল, নুন

আর তেল নিয়ে এল। জাতে জেলে এই মাঝিটি একটা চুলো আর তার ছোট্টো কড়াইটা আমাকে দিল, সঙ্গে কিছু কাঠ। ওরা ছ-পয়সা দিয়ে একটা ইলিশ মাছ কিনল। আমি মাছটা ভেজে একটা পেতলের থালায় রাখলাম আর এক পাত্তর ভাত ফুটিয়ে নিলাম। নৌকোতেই চান সেরে নিয়ে কলাপাতায় আমার জন্যে কিছুটা ভাত ঢেলে রেখে বাকিটা ওদের দিয়ে দিলাম। চৌকিদারও জাতে জেলে, সেজন্যে ওরা সকলে এক থালাতেই ভাত নিয়ে খেয়ে নিল। জাত যাওয়ার ভয় তো নেই।

চুপচাপ বসে বসে ভাবছিলাম—কোন রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি আমাকে এভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাকে অনবরত এত কষ্ট যে পেতে হচ্ছে, তা কি আমি নারী বলেই? কেউ কি কোনো পুরুষকে এভাবে নির্মম শাস্তি দিতে পারবে? আমি কার বউ, কার মেয়ে—অত শত খোঁজে ওদের দরকারটা কী? না জানতে পারলে ওদের রাতের ঘুম উড়ে যায় কেন? ওদের যে আমার জন্যে একরাশ চিন্তা, তা তো নয়। বরং আমার তত্ত্বতালাশ নেওয়ার জন্যে ওরা নিজেদের গাঁটের কড়ি ফেলতেও দ্বিধা করে না। এসবের মানে কী? ওরা এমন ভাবসাব করে যেন মনে হয় চলতি সামাজিক সংস্কার অনুসারে ওরা এমন কাজ করে। ওরা জানেই না আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, অথচ আমাকে আগলে রাখার ওদের কী অদম্য ইচ্ছে! কেন এরা এরকম করে, তা আমি ঠিক ভালোমতো বুঝতে পারি না। এই লোকজন ভাবে, আমার যাতে সব থেকে ভালো হয়, সে কাজটাই ওরা করছে। কিন্তু আমার উৎকণ্ঠা বাড়ে, কেননা ওরা আমাকে আরও গভীর গাড্ডায় ফেলে দিচ্ছে। আমার জীবনটা মনে হয় এরকম বেখাপ্পা উলটোপালটা ঘটনার দকে পড়ে গেছে। কপালে যা আছে তাই হোক, আর ভাবতে পারছি না কিছু।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানি না, কতক্ষণ ঘুমিয়েছি। মুনশিগঞ্জের ঘাটে নৌকো ভিড়ল সন্ধ্যে নামার ঠিক আগে। চৌকিদার জোরে জোরে আমাকে ডাকল: 'মা, উঠে পড়ুন,

ওরা আমার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছিল: 'এই ওঠো! ওঠো! তুমি কে?' কেউ কেউ বলল: 'মনে হচ্ছে কারও-না-কারও বউ বা মেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।' এইরকম সব কথাবার্তা বলে ওরা আমাকে জ্বালিয়ে মারছিল।

চলে আসুন।' উঠে পড়ে দেখলাম, কয়েকজন বাবু হাঁটাহাঁটি করছেন। এখন তো চৌকিদার আমায় থানায় নিয়ে যাবে। মনে মনে ভয়। কে জানে, ওরা ওখানে আমাকে নিয়ে কী করবে? এসব ভাবতে ভাবতে নৌকো থেকে নামলাম।

নৌকো থেকে নেমেই আমি এক বাবুর পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম: 'বাবা! আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই। আমি কিচ্ছুটি করিনি, তবুও ওরা আমাকে জোর করে থানায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' তিনি তক্ষুনি চৌকিদারকে ডেকে জিগেস করলেন: 'ও কী করেছে?' চৌকিদার বলল: 'না, উনি কিছু করেননি। পঞ্চায়েত সভাপতি বললেন: "এ মেয়েটি নিশ্চয়ই কারও বউ বা মেয়ে—বাড়ি থেকে পালিয়েছে। ওকে থানায় নিয়ে যাও।" ' বাবু মন দিয়ে শুনলেন, তারপর আমাকে জিগেস করলেন: 'তুমি কে বাছা?' আমি নিজের পরিচয় গোপন রেখে বললাম: 'আমি রেজিস্ট্রারের বাড়ি বেশ কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু এখন আর মোটেও থাকতে চাই না। সেজন্যেই অন্য কোথাও যাব বলে বেরিয়েছি। এই লোকজন আমাকে জোর করে থানায় নিয়ে যেতে চাইছে।' এ-কথা শুনে উনি বললেন: 'ভয় পেও না বাছা! তোমাকে থানায় যেতে হবে না। আমি স্বর্ণকমলবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। কী হয়েছে-না-হয়েছে, সব খোঁজখবর নিচ্ছি। তারপর একটা সুবন্দোবস্ত করে ফেলা যাবে। চৌকিদার, যাও স্বর্ণকমলবাবুকে নিয়ে এসো। তাঁকে বোলো, প্রথম-মুনসেফ চণ্ডীবাবু

কিছুদিন বাদে ঠাকমা আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গাঁয়ে ফিরে গেলেন। আমার জীবনটা 'রাধাচক্রস্বরূপ' এক বিপুল ঘুরপাক খেয়ে যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে গেল।

ডেকে পাঠিয়েছেন।' আমি ফের তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কাকুতিমিনতি করতে লাগলাম: 'দোহাই, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ফের রেজিস্ট্রারের বাড়িতে পাঠাবেন না। ওরা আমাকে যখন-তখন মেরে ফেলতে পারে; এই ভয়ে ও-বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি।'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই স্বর্ণকমলবাবু এসে হাজির। এসেই বলে উঠল: 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি? গোটা দিন ধরে হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি করেও তোমায় কোথাও খুঁজে পাইনি!' মুনসেফ বললেন: 'আমাকে একটু বলবেন কী, এই মেয়েটি কে?' স্বর্ণকমল অপলক চোখে বেমালুম মিথ্যে বলে গেল: 'ও আমার মাসতুতো বোন। ওর কেউ নেই, তাই আমাদের বাড়িতেই থাকে। ওর মাথায় ঢুকেছে যে আমরা ওকে মেরে ফেলব, তাই মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকেই পালায়। রাতে ঘুমোয় না, নিশুত রাতে একা একা ঘুরে বেড়ায়। এই আবার একটা কাণ্ড ঘটাল। সবসময় অবশ্য ও এমন করে না, শান্তই থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝেই এমন উদ্দণ্ড মারমুখী হয়ে ওঠে; পুরোপুরি খেপি।' বুঝতে পারলাম, চণ্ডীবাবু ওর সব কথা বিশ্বাস করেছেন। আমাকে বললেন: 'যাও বাছা, স্বর্ণকমলবাবুর সঙ্গে বাড়ি যাও। ওর ঠাকুমা

তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা। সারা দিন কিচ্ছুটি মুখে তোলেননি। কেউ তোমাকে মেরে ফেলবে না। আমি, প্রথম মুনসেফ চণ্ডীচরণ সেন, তোমাকে কথা দিচ্ছি সব কিছুর জন্যে আমি দায়ি থাকব।'

বেশ টের পেলাম, ওরা ধরেই নিয়েছে আমি একটা ছিটেল, পাগলাটে। ফলে আমার সব যুক্তিই যে ওরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে, এ আর বেশি কথা কী! পাগলের কথায় কে কবে কান দেয়? ফিরে এলাম ফের স্বর্ণকমলের বাড়ি। আমার দশা, 'যথা পূর্বং তথা পরং'। ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ঠাকুমা আমায় একপ্রস্থ ঝেড়ে তাঁর গায়ের

বেশ টের পেলাম, ওরা ধরেই নিয়েছে আমি একটা ছিটেল, পাগলাটে।

ঝাল মেটালেন। স্বর্ণর বউ, যার অমন মিষ্টি মিষ্টি কথা, সে এখন কাকের মতো চেঁচাতে লাগল: 'ভদ্দরঘরের মেয়ে না তুমি! একা একা সারা রাত কোথায়, কার সঙ্গে কাটালে?' আমি টুঁ শব্দটি করলাম না। এইসব নোংরা কথাগুলো স্রেফ গিলে নিলাম। ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে ভাবতে লাগলাম: 'এবারে ওরা আমাকে নিয়ে কী করবে? আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে ওদের এত আকুলতার কারণটাই বা কী? এসবের মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কিছুদিন বাদে ঠাকমা আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর গাঁয়ে ফিরে গেলেন। আমার জীবনটা 'রাধাচক্রস্বরূপ' এক বিপুল ঘুরপাক খেয়ে যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে গেল। পুজো এসে গেল বলে; তাঁর আর এখানে এক মুহূর্তও থাকার অবসর নেই। বাড়ি ফিরেই তাঁকে পুজোর সব আয়োজন সারতে হবে। পুজোর মাত্র আর চব্বিশ দিন বাকি। তিনি আর আমি ফিরে গিয়েই চিঁড়ে, মুড়ি, মুড়কি ভাজতে বসলাম আর বড়ো বড়ো মাটির জালায় ভরে রাখলাম। সকলেই যে যার কাজে লেগে পড়েছে—কেউ ছোলা ভাজছে, কেউ-বা সুপুরি কাটছে, নয়তো আতপ চালের কাঁকড় বাছছে। বারমহলে কুমোর মূর্তি গড়ার কাজে মগ্ন। রজনীকমল নৌকো করে প্রচুর পুজোর পসরা নিয়ে এসেছেন।

নারী-কুটুমরা নানা জায়গা থেকে আসতে শুরু করেছেন। স্বর্ণর পিসি তাঁর তিন ছেলের-বউ আর নাতিনাতনি নিয়ে এসেছেন। বিমলা আর তার কর্তাও এসেছে। বাড়িভর্তি লোক গিজগিজ করছে। কেউ যে কারও খবর নেবে—তার ফুরসত নেই। কিন্তু বন্দোবস্ত এতটাই সুচারু রকমের পাকা যে কেউ-একজনও জলখাবার বা দুপুরের খাবার পায়নি—এমনটা হয়নি। সকালে চিঁড়ে আর ক্ষীর দিয়ে জলখাবার সেরে নিয়ে তিন-চারটে বউ কোমরে আঁচল বেঁধে নিয়ে হেঁশেলে রান্না করতে লেগে গেছে। রেঁধেবেড়ে লোককে খাইয়ে-দাইয়ে তাঁদের বেশ ফুর্তিতেই দিনটা কাটছে। সবার শেষে এল স্বর্ণ আর তার বউ। পুজোর দিন ক-টাতে গাঁয়ের সব লোকের এখানেই দুপুরে পাত পড়েছিল। ফলে তাদের পুজোর আনন্দ যেন কয়েক গুণ বেড়ে গেল। ধোপা, নাপিত—সকলেই এসে পাত পেড়ে খেয়েছে—একজনও কেউ বাদ পড়েনি। আমাদের সকলকে কাজ বেঁটে দেওয়া হয়েছিল। আমরা যে যার কাজ নিয়ে পড়েছিলাম। মেয়েরা পুজোর সব কাজই করছিল—আনাজ কেটেকুটে উঠোনে ডাঁই করে রাখছিল। সেগুলো পুকুর থেকে ধুয়ে আনছিল, চাল ধুয়ে আনছিল—এইসব আরও শত রকমের কাজ। আর, অবশ্যই, চলছিল পান সাজানো। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, এই বিপুল বহরের রান্নাবান্না, আরও নানা রকমের কাজ বাড়ির বউরা আর মেয়েরা মিলেই সেরে ফেলল। এত কাজ করতে করতে কারও এতটুকু মুখভার হয়নি, বরং তারা কাজ করছিল প্রাণের আনন্দে।

পুজো শেষ হল। খুড়িমা ও অন্যরা যে যার বাড়ি চলে গেলেন। কেননা তাঁদের নিজেদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো আছে। শুধু রয়ে গেল বাড়ির কন্যেরা। তারা যাবে তাদের কর্তাদের ছুটি শেষ হওয়ার পর। নলিনীর (স্বর্ণর বোন) সঙ্গে আমার বেশ মিতালি হয়ে গেল। আমি ওর বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করতাম। ওকে আমার একটা চমৎকার মনের মানুষ মনে হয়েছিল। ওর বর আদিত্যবাবু, সরল মনের মানুষ। তার সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হত। ওরা আমাকে 'বোনদিদি' বলে ডাকত।

একদিন নলিনী বলল: 'তুমি যদি আমাদের বাড়িতে আসো, তাহলে আমার খুব উপকার হয়।' বললাম: 'ঠাকমাকে বলে দ্যাখো! তিনি

'আমি তোমার সঙ্গে কয়েক দিন থাকতে চাই; যেতে হবে ঠাকমাকে না জানিয়ে।' নলিনীর সঙ্গে অনেক সলাপরামর্শ করলাম—কীভাবে এই কাজটা সারব।

অনুমতি দিলেই আমি যেতে পারি।' কিন্তু ঠাকমা এ অনুরোধে সায় দিলেন না। বুঝলাম, আমাকে এই গাঁয়ে, এই বাড়িতেই পাকাপাকিভাবে থাকতে হবে—আর কোনো চারা নেই। নলিনীকে বললাম: 'আমি তোমার সঙ্গে কয়েক দিন থাকতে চাই; যেতে হবে ঠাকমাকে না জানিয়ে।' নলিনীর সঙ্গে অনেক সলাপরামর্শ করলাম—কীভাবে এই কাজটা সারব। আমি আমার সমস্ত জিনিসপত্র আর শাড়ি-জামাকাপড় নলিনীর তোরঙ্গে ভরে দিলাম। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক অভিধানকার ও প্রাবন্ধিক।

ভিখারি বুড়ির গল্প

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক

“কী শুনলি রে?” আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল বুড়ি।

আমি বুড়ির বুকের থেকে স্টেথো তুলে বললাম, “ঠিক আছে। খারাপ কিছু নেই।”

“কিচ্ছু খারাপ নাই? তুই তা’লে ভালো ডাক্তার নোস। আমার বুকির ভেতর তুই কিচ্ছু শুনতে পেলি নে। সোয়ামী, দুই জোয়ান ব্যাটাকে হারানোর ব্যথা, তাও কিচ্ছু শুনতে পেলি নে?”

আমি বিরক্ত হলাম। আউটডোরে বিশাল লাইন। তার মধ্যে বুড়ির দার্শনিক কথাবার্তা। কিছুক্ষণ আগে ‘গোপাল, গোপাল’ বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। তারপর বলেছে, “তোকে দেখতে অবিকল আমার মরে যাওয়া বড়ো ছেলেটার মতো।”

এই কথাটা আমি মাঝে মাঝেই শুনি। বিশেষ করে বুড়িদের অনেকেরই দাবি আমি তাদের ছেলে অথবা স্বামীর মতো দেখতে। আমার দুর্ভাগ্য আজ পর্যন্ত কোনো কম বয়সি মেয়ে এই দাবি করেনি।

যাইহোক, বুড়ির উপর আমার রাগ ক্রমেই বাড়ছে। কারণ স্পষ্ট দেখলুম যে হাত এতক্ষণ সে আমার মাথায় বুলাচ্ছিল, সেই হাতে বুড়ি নাক থেকে সিকনি বার করে কাপড়ে মুছল। আমি একটু সরে বসলাম। বলা যায় না, কখন আবার ওই হাত আমার মাথায় বুলিয়ে দেয়।

তাকে কাটানোর জন্য বললাম, “ঠাকুমা, আমি তোমার বুকের

“আর বকিও না। আমার অনেক কাজ আছে। এবার কেটে পড়ো।” তারপর পরের জনের টিকিটটা টেনে নিলাম।

ব্যথার কারণ বুঝতে পারছি না। যাও, নীচের থেকে ইসিজি আর এক্স-রে করে আনো। পয়সা-টয়সা কিছু লাগবে না। হাসপাতালে সব বিনা পয়সায়।”

বুড়ির আরও কিছু মনে হয় বলার ইচ্ছে ছিল। সুযোগ দিলাম না। অত্যন্ত অভদ্রভাবে তাকে বললাম, “আর বকিও না। আমার অনেক কাজ আছে। এবার কেটে পড়ো।” তারপর পরের জনের টিকিটটা টেনে নিলাম।

মাঝে মাঝে নিজেই অবাক হয়ে যাই। আমার এ কী পরিবর্তন। একজন থুত্থুড়ে সহায় সম্বলহীন ভিখারি বুড়ির সাথেও খারাপ ব্যবহার করছি!

আমার এই অহেতুক রাগ, এই অধৈর্য ভাব, এই অভদ্র ব্যবহার অনেকদিন ধরে অনেক ঘা খাওয়ার ফলাফল, যা আমার মনের নরম অনুভূতিগুলোকে প্রায় নষ্ট করে ফেলেছে। কীরকম সে আঘাত? তাহলে একটা গল্প শুনুন।

আমার তখন তেইশ-চব্বিশ বছর বয়স। মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের হাউস স্টাফ। নাইট ডিউটি চলছে। রাত তিনটের সময় অনকল রুমে সবে চোখটা একটু বুজেছি, এমন সময় অ্যাকিউট ফিমেল ওয়ার্ড থেকে কলবুক।

ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকে একটা বিরল দৃশ্য দেখলাম। সিস্টারদিদি হাঁটুমুড়ে বসে মেঝেতে ভর্তি একজন রোগিণীকে ‘সি পি আর’ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

ওয়ার্ডে একজন বা দু-জন সিস্টার। আর আশি থেকে একশো জন মরণাপন্ন রোগী। দিদিরা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েই ডিউটি করেন। চেয়ার ছেড়ে তাদের উঠে দাঁড়াতে দেখা যায় খুবই কম। সেখানে একজন রোগীকে বাঁচানোর জন্য সিস্টার নিজেই সি পি আর শুরু করেছেন, এই দৃশ্য বিরল।

আমায় দেখে দিদি বললেন, “দেখুন স্যার, আর নেই মনে হচ্ছে।”

আমি বুকে স্টেথো বসালাম। চোখ টেনে টর্চের আলো ফেললাম। জীবনের কোনো লক্ষণ নেই। বললাম, “দিদি, আর চেষ্টা চালিয়ে লাভ নেই। পেশেন্ট অলরেডি এক্সপায়ার্ড।”

বেডটিকিটটা নিলাম। পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের কেস। বুকের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। দু-পাশের ফুসফুসই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

মৃত রোগীটির চেহারাও খুবই খারাপ। হাড়ের উপর শুধু চামড়া লাগানো। বেড টিকিটে বয়স দেখলাম। মাত্র ছাব্বিশ বছর।

সিস্টার দিদি ওদিকে বলছেন, “বড্ড ঝামেলা হয়ে গেল। বাড়ির লোককে মৃত্যুর খবর কি আপনিই বলবেন? নাকি সিনিয়র কাউকে ডাকবেন?”

আমি বললাম, “কেন? গণ্ডগোলের পার্টি নাকি? পেশেন্টের চেহারা দেখেছেন। কে জানে বিনা চিকিৎসায় কতদিন ফেলে রেখেছিল? এইসব রোগীদের বাড়ির লোকই বেশি ঝামেলা করে। জীবিত অবস্থায় বিন্দুমাত্র

সেবা-যত্ন করে না। মৃত্যুর পর যত দরদ উথলে ওঠে। ডাক্তার পিটিয়ে সেই দরদের বহিঃপ্রকাশ হয়।"

সিস্টার দিদি বললেন, "আপনি যা ভাবছেন, ব্যাপারটা সেরকম নয়।"

আমি বললাম, "মার খাওয়ার ভয় না থাকলে বাড়ির লোককে মৃত্যুর খবর ঘোষণা করতে আপত্তি কোথায়। আপনি আয়া মাসিকে বলুন বাড়ির লোককে ডাকতে।"

সিস্টারদিদি বললেন, "ডেকে পাঠাতে হবে না। ওর বাড়ির লোক বারান্দাতেই আছে। আমার সাথে আসুন।"

আমি আরও একবার অবাক হলাম। সিস্টারের ব্যবহার পুরোটাই অচেনা লাগছে। ওনার পেছন পেছন বারান্দাতে এলাম। শীতের রাত। রোগীর বাড়ির লোকেরা ঠাণ্ডা মেঝের উপর পলিথিন পেতে ঘুমাচ্ছে। সিস্টার দিদি একদম কোনায় এসে থামলেন। তারপর একটা কুঁকড়ে শুয়ে থাকা সাত-আট বছরের শিশুকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে

মেয়েটির স্বামী অসুস্থ স্ত্রী আর ছেলের খরচ টানতে না পেরে পালিয়েছে। ... গতকাল রক্ত বমি করার পর কিছু লোকজনের সাহায্যে বাচ্চাটি ওর মাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। কি, বাচ্চাটিকে ডাকব? বলতে পারবেন ওর মায়ের মৃত্যুর খবর?

আপনার বাড়ির লোক।"

"মানে? বাড়ির অন্যরা কোথায়?"

"আর তো কেউ নেই। ছেলেটির কাছে শুনেছি ওরা বছর খানেক আগে বাংলাদেশ থেকে এপারে এসেছে। আসার পর থেকেই মেয়েটি শুধু ভুগছিল। মেয়েটির স্বামী অসুস্থ স্ত্রী আর ছেলের খরচ টানতে না পেরে পালিয়েছে। মা, আর ছেলে ভিক্ষা-টিক্ষা করে কোনোরকমে টিকে ছিল। গতকাল রক্ত বমি করার পর কিছু লোকজনের সাহায্যে বাচ্চাটি ওর মাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। কি, বাচ্চাটিকে ডাকব? বলতে পারবেন ওর মায়ের মৃত্যুর খবর? গ্যারান্টি দিচ্ছি, মার খাওয়ার কোনো ভয় নেই।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "দিদি, এখন কী হবে?"

উনি বললেন, "আমার মনে হয় বাচ্চাটিকে কিছু বলার দরকার নেই। আমি একা ডিউটিতে। আপনি আমাদের টেবিলে গিয়ে একটু বসতে পারবেন? তাহলে আমি ছেলেটাকে শিশু বিভাগে ভর্তি করে আসি। আপাতত একটা সুরক্ষিত জায়গায় থাকুক। পরে ওরাই কোনো হোম-টোমে যোগাযোগ করে পাঠিয়ে দেবে। মৃতদেহটা আনক্লেমড বডি হিসাবে মর্গে পাঠিয়ে দেবো।"

উনি আধা ঘুমন্ত শিশুটিকে নিয়ে ইমার্জেন্সির দিকে গেলেন।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু আমার নয়, প্রত্যেক চিকিৎসকেরই আছে। বার বার ঘা খেতে খেতে আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি, মায়া মমতা, সংবেদনশীলতা এগুলি বর্মের আড়ালে চলে যায়। এরকম প্রচুর ঘটনা লিখতে বসে মনে পড়ছে। কিন্তু সেসব পরে শোনানো যাবে। আপাতত বুড়ির গল্পে ফেরত আসি।

ঘণ্টাখানেক বাদে বুড়ি আবার এসে উপস্থিত। হাতে এক্স-রে প্লেট আর ইসিজি। এক্স-রে থেকে তখনও টপ টপ করে জল পড়ছে। আমাদের আউটডোর দোতলায়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার জন্য বুড়ি হাঁপাচ্ছে। ভালো করে কথা বলতে পারছে না।

বুড়ি লোকজনকে ঠেলে আমার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল। আমি আবার ধমক লাগালাম, "এই যে ঠাকুমা, ঠেলাঠেলি না করে ওই পাখার তলায় বসো। এক্স-রে প্লেটটা শুকিয়ে যাক। তারপর দেখছি। আমিই ডেকে নেবো।"

বুড়ির কথা ভুলেই গেছিলাম। আড়াইটে নাগাদ রোগী ফাঁকা হতেই বুড়ি হাজির। বলল, "এইবার দেখবা গোপাল?"

আমি একটু লজ্জিত হলাম। বুড়িকে ডেকে নেবো বলে ভুলেই গেছি। বেচারা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। হাত বাড়িয়ে এক্স-রে নিলাম।

এক্স-রে-র ছবিটা খুব চেনা। মারণ রোগ বুড়ির ডান দিকের ফুসফুসে বাসা বেঁধেছে। টেনিস বলের মতো একটা সাদা ছায়া। এখান

বুড়ির পক্ষে আর জি করে যাওয়া আর সেখানে বক্ষ বিভাগে দেখিয়ে সিটি স্ক্যান, এফ এন এসি ইত্যাদি করা প্রায় এভারেস্টে ওঠার সমতুল্য। তাছাড়া করেও বিশেষ লাভ নেই। যদি সত্যি ক্যান্সার হয় . . .

থেকে আস্তে আস্তে বিষাক্ত অমর কোষগুলি ছড়িয়ে যাবে দেহের আনাচে কানাচে।

বললাম, "ঠাকুমা, এক্স-রে-তে একটু অসুবিধা আছে। আরও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। এই ছোটো হাসপাতালে হবে না। তুমি আর জি কর হাসপাতালের বক্ষ বিভাগে গিয়ে দেখাও।"

বুড়ি বলল, "কী করে যাব গোপাল। চোখে দেখিনে, হাঁটতে গেলে হাঁফ ধরে। সাত কুলে কেউ নাই। ভিক্ষা করে খাই। কারে নিয়ে যাব?

তুই যা পারিস ওষুধ দে। আমার গোপালের ওষুধে সবার রোগ সারছে, আর আমার বুকে ব্যথা সারবে নে?”

বুঝলাম বুড়ির পক্ষে আর জি করে যাওয়া আর সেখানে বক্ষ

“. . . একটু কৃষ্ণ নাম শোন। শুধু শুধু ভিক্ষা নিতে খারাপ লাগে।” “ভিক্ষা কোথায় দিলাম?” “এই যে, এতগুলান ওষুধ দিলি।” “ও তো সরকার দিচ্ছে। আমি কোথায় দিলাম।” বুড়ি বলল, “সরকারকে আমি কনে পাব। আমার কাছে তুই হলি গে সরকার।”

বিভাগে দেখিয়ে সিটি স্ক্যান, এফ এন এসি ইত্যাদি করা প্রায় এভারেস্টে ওঠার সমতুল্য। তাছাড়া করেও বিশেষ লাভ নেই। যদি সত্যি ক্যান্সার হয় (এবং সেটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি) তাহলে এই অবস্থায় চিকিৎসা করা আর না করা প্রায় সমান।

আমি বললাম, “হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাবে নাকি? হাঁটতে গেলেই তো হাঁপাচ্ছ। ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করবে কী করে?”

“যে ক-দিন পারি করব। পরের উপর বসে খেতে ভালো লাগেনে। একেবারে না পারলে আমার গোপালের কাছে চলে আসব।”

আমি ওষুধ লিখে দিলাম। বুড়ি বলল, “গোপাল, একটু কৃষ্ণ নাম শোন। শুধু শুধু ভিক্ষা নিতে খারাপ লাগে।”

“ভিক্ষা কোথায় দিলাম?”

“এই যে, এতগুলান ওষুধ দিলি।”

“ও তো সরকার দিচ্ছে। আমি কোথায় দিলাম।”

বুড়ি বলল, “সরকারকে আমি কনে পাব। আমার কাছে তুই হলি গে সরকার।”

আমি হাসলাম। বললাম, “ঠাকুমা, এখন সময় হবে নাগো। পরে একদিন . . . ”

জানি সেই একদিন কখনোই আসবে না। কেউ কথা রাখে না। সরকার তো নয়ই।

তবে আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় ছোটো ছোটো কথাগুলো রাখার চেষ্টা করলে কেমন হয়। কত অহেতুক আনন্দ, কত অযাচিত সম্পর্ক, কত বাড়িয়ে দেওয়া হাত আমি অগ্রাহ্য করে গেলাম সময় নেই বলে। সত্যি কি আমার সময় নেই, নাকি নিজেকে একটু ব্যস্ত করে দেখানোর মোহ আমাকেও পেয়ে বসেছে? স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. ঐন্দ্রিল ভৌমিক, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

Advt.

ডা. নন্দ ঘোষের চেম্বার

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা

১.

—দ্যাক না বাপু, লাতিটার আজ সাতদিন গেদে জ্বর। গা যেমন আগুন . . . আর সকাল-সন্দা কঠিন কাশি। কাশতে কাশতে যেমন আলা হয়েইল . . .

ডা. ঘোষ গম্ভীর মুখে দেখেটেখে বললেন—

—বুঝলে ঠাকুমা, তোমার নাতির বুকে তো প্রচুর কফ জমেছে গো . . . একে তো ক-দিন ভর্তি রাখতে হবে . . .

—তুই যা করবি করে দে বাপু—অকটু ওসুদ-টসুদ দে।

—আচ্ছা এই কাগজটা নিয়ে ইমার্জেন্সিতে দেখাও। ভর্তি হয়ে যাবে।

সে যাত্রায় নিউমোনিয়ায় ভোগা বাচ্চাটা দিন সাতেক বাদে বাড়ি গেল। ডা. ঘোষ ছুটির সময় দিন সাতেক বাদে একবার এসে দেখিয়ে যেতে বলে আউটডোরে দৌড়োলেন।

. . . আবার জ্বর হচে ত . . . গুণিন কত কী মন্তর দিল বাপু, জ্বর ত কাটার নাম নাই . . .
—সে কী গো, জন্ডিস ঝাড়িয়েও লাভ হল না?

তারপর যথারীতি আর পাঁচটা ঘটনার মতো এই বাচ্চাটার কথাটাও তিনি ভুলে গেলেন।

দিন গেল . . .

মাস গেল . . .

হঠাৎ প্রায় বছর দেড়েক বাদে সেই বাচ্চাকে নিয়ে সেই ঠাকুমা উপস্থিত।

—কই লো বাপু, আবার আসসি।

—সে তো বুঝলাম কিন্তু তোমার তো দেখা-সাক্ষাৎ নেই গো . . .

—কী বলব বাপু, তমার কাচ থেকানু জাবার পর মোদের গেরামের গুণিন দ্যাখা বলে "বাচ্চার কীসব চিকিচ্ছা করাইছ? ইয়ার জন্ডিস কাটাইতে হবে। জ্বর হল্যা জন্ডিস না কাটি দিলে জ্বর ভিতরে রয়্যা জায়। তারপর দু-দিন ছাড়া জ্বর হয়। ইসব বুজিনি মোরা। উসব ডাক্তরের ছল, বার বার ভুগলে বার বার কর্য়া ডাক্তর-ঘর ছুটাইবে আর তমার পইসা খিঁচবে।"

বল্যা তো পিটে ছ-টা ফুটা করিয়্যা জন্ডিস কাটি দিসলি।

—ভালো তো, তা এবার কী সমস্যা?

—আবার জ্বর হচে ত . . . গুণিন কত কী মন্তর দিল বাপু, জ্বর ত কাটার নাম নাই . . .

—সে কী গো, জন্ডিস ঝাড়িয়েও লাভ হল না?

ডাক্তারবাবু নীচের দিকে তাকিয়ে কলম চালাতে চালাতে মুচকি হেসে মৃদু স্বরে গাইছিলেন . . . "হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল—পার করো আমারে . . ."

এবারও প্রায় দিন দশেক বাদে সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবার সময় বুড়ি ঠাকুমা গুণিনের উদ্দেশ্যে যে তিন-চার অক্ষর ব্যবহার করেছিল সেগুলো আর লিখলাম না—ডাক্তারবাবুর বারণ আছে।

২.

—কী সমস্যা?

—জ্বরের সাথে হাত-পা খিঁচা কর্য়া, চোখ উলটি কেমন করতিছে ছ্যানা . . .

—কখন থেকে এরকম হচ্ছে?

—কাল বিকাল থেকানু চারবার হচ্যা। এউ ত এক ঘণ্টা আগে একবার হল। ছ্যানা জেন লেতি গেছ্যা।

—কাল বিকেল থেকে এরকম হচ্ছে এতক্ষণ আনোনি কেন?

—ক্ষী??? কী বললে?
—মুরগিঝাঁকি জাননি কীগ . . . নাকের ভিত্রে পকা থাকে। মোদের মন্দিরের বাবুনের কাছে গ্যালে ফুল দিয়্যা আড়াই প্যাঁচে পকা বের কর্যা দেয়।

—আমরা জানি উ তো এমনি মুরগিঝাঁকি . . .

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ডা. ঘোষ পেশেন্ট দেখছিলেন। চমকে যেতে সাদা জামাটায় চা চলকে পড়ল। ঘাড় বাড়িয়ে, নীচু হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

—ক্ষী??? কী বললে?

—মুরগিঝাঁকি জাননি কীগ . . . নাকের ভিত্রে পকা থাকে। মোদের মন্দিরের বাবুনের কাছে গ্যালে ফুল দিয়্যা আড়াই প্যাঁচে পকা বের কর্যা দেয়।

—তা কাল থেকে পোকা বেরোল না?

—বাবুন বলছ্যা, এই পকাটা খুম বোড় আছে। খালি ঝাড়ল্যা হবেনিক। সে ঝেড়ে দিছ্যা . . . ইবার অকটু অসুদ খাবাইলে পুর‍্যা ঠিক হয়েইবে।

—এই কাগজটা নিয়ে ইমার্জেন্সি যাও। ভর্তি করো। পরের জন এসো . . .

আজ আবার রাউন্ডে গিয়ে জ্ঞান দিতে অনেকটা সময় যাবে ডা. ঘোষের। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সৌম্যকান্তি পণ্ডা, এমবিবিএস, ডিসিএইচ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে শিশুরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

টুকরো খবর

সময়ের আগে জন্মানো শিশুদের মৃত্যু হার কমাতে নতুন নির্দেশিকা

গর্ভাবস্থার ৩৭ সপ্তাহের আগে প্রসব বেদনা শুরু হলে তাকে বলা হয় প্রিটার্ম লেবার। ভারতে প্রতি বছর ২.৬ কোটি জীবিত শিশুর জন্ম হয়, তাদের মধ্যে ৩৫ লক্ষ শিশু জন্মায় সময়ের আগে। আর এই সময়ের আগে জন্মানো শিশুদের মধ্যে ৩.০৩ লক্ষ অর্থাৎ প্রায় ১০% মারা যায়। মৃত্যুর প্রধান কারণ রেস্পিরেটরি ডিসট্রেস সিনড্রোম অর্থাৎ শ্বাসকষ্ট। যারা বেচে থাকে তাদের মধ্যে শেখার অসুবিধা, শোনার ও দেখার অসুবিধা দেখা যায়।

দেখা গেছে প্রসবের আগে গর্ভবতী মায়েদের স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন দিলে শ্বাসকষ্টের রোগ কমে ৩৪%, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ কমে ৪৬%, অন্ত্রের সংক্রমণ কমে ৫৪% ক্ষেত্রে আর প্রিটার্ম শিশুমৃত্যু কমে ৩১%।

১৫ অক্টোবর ২০১৮-য় জারি করা এক নির্দেশে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অতিরিক্ত ডিরেক্টর, যিনি আবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম সচিব, নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেসব গর্ভবতী মহিলার ২৪ থেকে ৩৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে, তাদের উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে রেফার করার আগে এ এন এম একটি করে ডেক্সামেথাজোন ৬ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশন লাগিয়ে পাঠাবেন। তারপর ১২ ঘণ্টা ছাড়া আরও তিনটি ডেক্সামেথাজোন লাগাতে হবে অর্থাৎ মোট ২৪ মিলিগ্রাম এক-একজনকে।

এই নির্দেশনামার সঙ্গে প্রচারিত কর্ম নির্দেশিকায় বলা হয়েছে কোনো জটিলতা না থাকলে ৩৯ সপ্তাহের আগে যেন সিজারিয়ান সেকশন অপারেশন না করা হয় বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে যেন প্রসব বেদনা শুরু না করা হয়।

এই নির্দেশের উদ্দেশ্য হল পরিণত (mature) ও স্বাভাবিক ওজনের শিশুর জন্ম। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

টুকরো খবর

আশার আলো দেখালেন এইমসের বিজ্ঞানীরা: মাত্র ৩৫০০০ টাকায় এবার পাওয়া যাবে ভেন্টিলেটর

২০ বছরের শচীন শর্মা শচীন তেন্ডুলকারের মতো ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু তাকে আশ্রয় নিতে হল এইমসের নিউরোসার্জারি বিভাগের বিছানায়। চার বছর ধরে তাকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে। তার পরিবার চাইলেও তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না, কেননা বাড়ি নিয়ে যাওয়ার অর্থ ভেন্টিলেটর কেনা, ৫ থেকে ১০ লাখ টাকা যার দাম।

হাসপাতালে যে ভেন্টিলেটর থাকে তাতে অক্সিজেন লাগে, খরচ পড়ে সব মিলিয়ে দৈনিক ৫-৬ হাজার টাকা। কোথায় এত টাকা পাবেন শচীনের পরিবার।

এইমসের স্নায়ুরোগবিদ্যার অধ্যাপক ডা. দীপক আগরওয়াল এবং রোবোটিকস-এর অধ্যাপক দিবাকর বৈশ্যের আবিষ্কার এই ভেন্টিলেটর ওজনে হালকা, কম জায়গা নেয়, বিদ্যুৎ লাগে মাত্র দুটো টিউবলাইট জ্বালাতে যা লাগে ততটা, অক্সিজেনের বদলে ঘরের হাওয়াকেই এই মেশিন কাজে লাগাতে পারে, চালাতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত টেকনিশিয়ান লাগে না।

নতুন বানানো ভেন্টিলেটরটা আকারে ব্লুটুথ স্পিকারের মতো। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নজর রাখে, সমস্যা দেখলে অ্যাটেন্ডেন্টকে সতর্ক করে।

এই যন্ত্রে একটা 'ট্যাব' লাগানো থাকে যাতে রোগীর নাড়ির গতি, রক্তচাপ, ইত্যাদি দেখা যায়। এই যন্ত্রের বাজারে দাম পড়বে ৪৫০০০ টাকার মতো। 'ট্যাব'-এর বদলে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করলে দাম পড়বে ৩৫০০০ টাকা। হাসপাতালের বেডের সমস্যাও মেটাতে পারবে এই ভেন্টিলেটর। অনেকসময় ভেন্টিলেটরে থাকা রোগীদের অন্য প্রয়োজন না থাকলেও হাসপাতালে রেখে দিতে হয়, কেননা পরিবারের পক্ষে ৫-১০ লক্ষ টাকা খরচ করে বড়ো ভেন্টিলেটর কেনা সম্ভব নয়।

শচীনের বাবা কিষনলাল শর্মা আশা দেখছেন চার বছর পর এবার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে।

অধ্যাপক আগরওয়াল জানিয়েছেন শচীনের ওপর নতুন ভেন্টিলেটরের ব্যবহার ফল ফলছে। বারবার করে সে দেখছে ভেন্টিলেটরটাকে, হাসপাতাল ছেড়ে সে বাড়ি ফিরতে চায়।

পরিবারের লোকজনকে মেশিনটার ব্যবহার শেখানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ভারতে স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু খরচ পৃথিবীতে সবচেয়ে কম

কোনো নামি বেসরকারি হাসপাতালে একবার ডাক্তার দেখাতে যা খরচ হয় বা কোনো দামি হোটেলে পিৎজ়ার যা দাম তার চেয়েও কম খরচ করা হয় একজন ভারতীয়ের স্বাস্থ্যের জন্য এক বছরে।

বছরে ১,১১২ টাকা, মাসে ৯৩ টাকা, প্রতিদিন ৩ টাকা--একজন গড় ভারতীয়ের জন্য স্বাস্থ্যখাতে খরচ। বিরোধী পক্ষের হিসেব নয়, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী দ্বারা প্রকাশিত ন্যাশানাল হেলথ প্রোফাইলের হিসেব এটা।

২০০৯-এ স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ১.০২% খরচ করা হত, ২০১৮-তেও ১.০২%। পৃথিবীর গরিব দেশগুলো মোটামুটি স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ১.৪% খরচ করে।

শ্রীলঙ্কা মাথাপিছু খরচ করে ভারতের ৪ গুণ আর ইন্দোনেশিয়া ২ গুণ।

স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ৯.৪% খরচ করে মালদ্বীপ, ১.৬% শ্রীলঙ্কা, ২.৫% ভুটান আর ২.৯% থাইল্যান্ড।

২০১৭-র জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ২০২৫-এর মধ্যে জিডিপির ২.৫% স্বাস্থ্যখাতে খরচ করার কথা বলা হয়েছিল। বাস্তব হল ভারত এখনও ২০১০-এর লক্ষ্যমাত্রা ২% ই ছুঁতে পারেনি। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডাক্তারের কাজের চাপ ও রোগীর নিরাপত্তা

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত

লিবি জিওন আঠারো বছরের এক তরুণী, ভারমন্ট-এর বেনিংটন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। মানসিক অবসাদে ভোগার জন্য কিছু ওষুধপত্র খাওয়া শুরু করেছিল। কয়েকদিন সর্দিজ্বরে ভোগার পরে নিউইয়র্ক স্টেট হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাকে দেখতে যায় দু-জন ডাক্তার। ডা. ওয়েন্সটিন স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ট্রেইনি এবং ডা. স্টোন দ্বিতীয় বর্ষের। লিবির খিঁচুনি শুরু হয়। দুই ডাক্তার লিবিকে পরীক্ষা করে খিঁচুনি কমানোর জন্য পেথিডিন ইঞ্জেকশন দেন। অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট-এ লিবি মারা যায়। ৫ মার্চ, ১৯৮৪ সাল।

লিবির বাবা সিডনি, তার মেয়ের এই অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারেননি। ফৌজদারি ও দেওয়ানি, দু-টি আদালতেই মামলা চলে।

লিবির বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে ক্লান্ত ওই দুই জুনিয়র ডাক্তারের বদলে কোনো সিনিয়র ডাক্তার যদি তার মেয়েকে দেখত তাহলে তার মেয়ে বেঁচে যেত। এই অঘটন ঘটত না।

অভিযুক্ত চিকিৎসকরা শাস্তির মুখোমুখি হলেও আদালতের শেষ বিচারে শাস্তি মকুব হয়ে যায় কারণ আদালত এটিকে ইচ্ছাকৃত অবহেলা বলে মেনে নেয়নি। গল্পটি পাঠক হিসেবে হয়তো অনেকেরই পরিচিত লাগতে পারে। কিন্তু গল্পটি এখানেই শেষ নয়।

লিবির বাবা সিডনি ছিলেন প্রখ্যাত সংবাদপত্র *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর একজন লেখক। মেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে না পড়ে তিনি প্রায় একাই একটি ক্যাম্পেন বা প্রচার অভিযান চালিয়ে যান সুবিচারের আশায়। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে ক্লান্ত ওই দুই জুনিয়র ডাক্তারের বদলে কোনো সিনিয়র ডাক্তার যদি তার মেয়েকে দেখত তাহলে তার মেয়ে বেঁচে যেত। এই অঘটন ঘটত না।

আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি না যে এমন একটা উড়োজাহাজে চেপে বসেছি যার পাইলট একটানা ৩৬ ঘণ্টা জেগে আছেন। তার হাতে কিছুতেই সুরক্ষিত থাকতে পারে না আমার জীবন। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় "পেশেন্ট সেফটি" রুগীর সুরক্ষা। মেডিক্যাল নেগলিজেন্স বা চিকিৎসার ইচ্ছাকৃত অবহেলা একটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। দুটোকে এক করে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। তেমনিভাবে আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস বা অনৈতিক কাজকর্ম আরও একটি আলাদা বিষয়। প্রথমোক্তটিতে অর্থাৎ মেডিক্যাল নেগলিজেন্স-এ মানুষ প্রাণে মারা যায়, আর শেষোক্তটিতে ধনে।

রুগীর সুরক্ষা নামক একটি সমস্যা তুলে ধরার অর্থ এই নয় যে আলোচনা সেখানে শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই সমাধান চাই। সেই সমাধান খুঁজতে গেলে, এলোপাতাড়ি মন্তব্যই যথেষ্ট নয়। সমস্যাটির আকার, আয়তন, প্রকার—এইগুলি জানা বোঝা এবং দায় ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা একান্ত প্রয়োজন। সবাই মিলে সদর্থকভাবে চেষ্টা করে দেখা যাক।

প্রথমে দু-একটি তথ্য পরিবেশন করা যাক। এটি আলোচনার পটভূমিকা হিসেবে কাজ করবে।

রুগী সুরক্ষা একটি আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। উড়োজাহাজে সফর করলে এক মিলিয়নে একজনের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে গিয়ে ওই ক্ষতির সম্ভাবনা প্রতি তিনশো রুগীতে একজন। বিপদজনক হিসেবে চিহ্নিত বিমান যাতায়াত শিল্প বা আণবিক শক্তি শিল্পতে স্বাস্থ্য পরিষেবা শিল্প-এর

"পেশেন্ট সেফটি" রুগীর সুরক্ষা। মেডিক্যাল নেগলিজেন্স বা চিকিৎসার ইচ্ছাকৃত অবহেলা একটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। দুটোকে এক করে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

চেয়ে সুরক্ষা বিষয়ক রেকর্ড অনেকে ভালো।

বিশ্বব্যাপী রোগভার-এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ১৪তম স্থানে আছে রুগীসুরক্ষার সমস্যা। এটি পরিচিত দু-টি রোগ, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়াজনিত সমস্যার দায়ভার এর আয়তনের সাথে তুলনীয়। বিশ্বব্যাপী ৪২১ মিলিয়ন হাসপাতালে ভর্তির মধ্যে মোটামুটি ৪২.৭ মিলিয়ন রুগীর ক্ষেত্রে এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে।

উচ্চ আয়সম্পন্ন দেশগুলিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রুগীদের মধ্যে প্রতি ১০ জনে একজন এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই অঘটনগুলি (অ্যাডভার্স ইভেন্টস) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেগুলির মধ্যে প্রায় ৫০%-এর বেশি নিবারণযোগ্য।

২৬টি স্বল্প ও মাঝারি আয়সম্পন্ন দেশগুলিতে গবেষণায় দেখা গেছে যে ওই অঘটনের হার ৮ শতাংশ এবং যার মধ্যে ৮৩% নিবারণযোগ্য ছিল। ওই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় ৩০%-এর পরিণতি হয়েছে মৃত্যু। সারা পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ঘটনাগুলি ঘটেছে ওই স্বল্প ও মাঝারি আয়-এর দেশগুলিতে।

অসুরক্ষিত ওষুধ-ব্যবহার বা আনসেফ মেডিকেশন-এর জন্য বছরে কয়েক মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং এর ফলে প্রায় ৪২ বিলিয়ন ডলার অর্থ অপব্যয় হচ্ছে। এই টাকার অঙ্কটা স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়-এর প্রায় এক শতাংশ।

ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটিগুলি ঘটে যখন ওষুধ ব্যবহারের ব্যবস্থাপনা এবং মানবিক উপাদানগুলি যেমন কর্মীবাহিনীর একটানা কাজের ফলে ক্লান্তি, কাজকর্মের ধারার মধ্যে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, ও

অন্যান্য অঘটনগুলি যেমন ১. শিশুচুরি বা অদলবদল; ২. রুগীর ওপর ঘটে যাওয়া যৌন নিগ্রহ বা ধর্ষণ; ৩. অগ্নিদগ্ধ হওয়া; ৪. পোকামাকড়, মশামাছি, জীবজন্তুর দংশন ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এগুলির আলাদা গুরুত্ব আছে।

কর্মীস্বল্পতার সংকট এই বিষয়গুলি একসাথে যুক্ত হয়ে ওষুধ নিদান দেওয়া, লেখা, বিলি করা, নজরদারি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে ফেলে। এর ফলে উৎপন্ন হয় গুরুতর ক্ষতি, বিকলাঙ্গতা এমনকী মৃত্যু।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রতি ১০০জন রুগী পিছু ১৪জন হসপিটাল ইনফেকশন বা 'হাসপাতাল-জনিত সংক্রমণ'-এ আক্রান্ত হয়। ইউরোপ ইউনিয়নের দেশগুলিতে প্রতিবছর প্রায় ৩.২ মিলিয়ন রুগী এই সংক্রমণের শিকার হয় এবং তাদের মধ্যে সরাসরি এই কারণের জন্য ৩৭ হাজার মৃত্যু হয়।

সহজ, সরল ও সস্তা কতগুলি ব্যবস্থা যেমন উপযুক্ত হস্ত স্বাস্থ্যবিধান বা হ্যান্ড হাইজিন, এইসব গ্রহণ করলে এই ধরনের হাসপাতাল-জনিত সংক্রমণের হার অন্তত ৫০% কমিয়ে আনা সম্ভব।

প্রতি বছর প্রায় সাত মিলিয়ন রুগী অস্ত্রোপচার-জনিত প্রবল সমস্যায় ভোগার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যান এবং তাঁদের মধ্যে এক মিলিয়ন শেষপর্যন্ত মারা যান। যদিও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে অস্ত্রোপচার-জনিত সংকটের পরিমাণ গত পঞ্চাশ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবুও স্বল্প আয়ের দেশগুলিতে এই ধরনের জটিলতার পরিমাণ উচ্চ আয়ের দেশগুলির তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ পর্যন্ত বেশি।

এই অঘটনগুলিকে বন্ধ করা বা কমিয়ে নিয়ে আসার লক্ষে যে কৌশলগত ব্যবস্থা বা স্ট্র্যাটেজিক মেজার নিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল একটি শক্তিশালী তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। "sentinel event surveillance" বা সেন্টিনেল ইভেন্ট সার্ভিলেন্স বলে একটা বিষয় আছে। তাতে হাসপাতালে ঘটে যাওয়া কতগুলি গুরুতর দুর্ঘটনায় নজরদারি করার কথা। যেমন: ১. রুগী বেড থেকে পড়ে যাওয়া; ২. ভুল ইঞ্জেকশন বা ওষুধ খাইয়ে দেওয়া; ৩. ভুল ব্লাড গ্রুপের রক্ত চালানো; ৪. ভুল অঙ্গে অপারেশন করা; ৫. একজনের রক্ত বা অন্য নমুনা আরেকজনের ল্যাব পরীক্ষার রিপোর্ট অদলবদল করা; ৬. ভুল রুগীকে অপারেশন করা; ৭. অপরিশোধিত সূচ ব্যবহারের

অসুরক্ষিত ওষুধ-ব্যবহার বা আনসেফ মেডিকেশন-এর জন্য বছরে কয়েক মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং এর ফলে প্রায় ৪২ বিলিয়ন ডলার অর্থ অপব্যয় হচ্ছে। এই টাকার অঙ্কটা স্বাস্থ্যখাতে মোট ব্যয়-এর প্রায় এক শতাংশ।

মাধ্যমে সংক্রমণ; ৮. শিরায় তরল যেমন স্যালাইন ইত্যাদি চালানোর পরে শিরার প্রদাহ; ৯. ক্যাথেটার ব্যবহারের পরে মূত্রনালীতে সংক্রমণ; ১০. দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থাকার পরে শয্যা-ক্ষত বা বেডসোর; ১১. এক্স-রে, রেডিয়োথেরাপি ইত্যাদি থেকে নিঃসৃত আওনাইনজিং বিকিরণের জন্য ক্ষতি ইত্যাদি।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রুগীর সম্বন্ধে ঘটে যাওয়া অন্যান্য অঘটনগুলি যেমন ১. শিশুচুরি বা অদলবদল; ২. রুগীর ওপর ঘটে যাওয়া যৌন নিগ্রহ বা ধর্ষণ; ৩. অগ্নিদগ্ধ হওয়া; ৪. পোকামাকড়, মশামাছি, জীবজন্তুর দংশন ইত্যাদি বিষয়গুলিও ব্যাপক অর্থে ওই সেন্টিনেল ইভেন্ট হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য যদিও সরাসরিভাবে এগুলি চিকিৎসা-পরিষেবা হিসেবে গণ্য নয়। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এগুলির আলাদা গুরুত্ব আছে।

এই অঘটনগুলি লিপিবদ্ধ করা হল প্রাথমিক কাজ। তারপরে কী কারণে ওই গাফিলতি হল সেটা বিশ্লেষণ করা ও সবশেষে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া—এইগুলি হল এই নজরদারি ব্যবস্থার ধাপ। খাতায় কলমে থাকলেও এই নজরদারি ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে খুবই দুর্বল।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে দুর্ঘটনা (এমনকী পথ দুর্ঘটনাও) এমনি এমনি হয় না। লাক বা চান্স বলে কিছু নেই। প্রত্যেকটা দুর্ঘটনা ঘটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এটি জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিন-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গত শিল্প দুর্ঘটনা ও কু-স্বাস্থ্যও মৃত্যুর বড়ো কারণ আমাদের দেশে। এগুলি প্রতিরোধযোগ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখতে হবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রুগীর সুরক্ষার বিষয়টিকে।

ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি অঘটন সম্পর্কে কিছু জরুরি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করতে পারেন। এর বিভিন্ন মডেলের মধ্যে একটি সুপরিচিত

. . . দুর্ঘটনা (এমনকী পথ দুর্ঘটনাও) এমনি এমনি হয় না। লাক বা চান্স বলে কিছু নেই। প্রত্যেকটা দুর্ঘটনা ঘটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। এটি জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাইজিন-এর অন্তর্ভুক্ত।

মডেলের নাম হল "মিনিমাল ইনফরমেশন মডেল ফর পেশেন্ট সেফটি" বা সংক্ষেপে এম আই এম পি এস। এই মডেল অনুযায়ী ন্যূনতম যে তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয় সেগুলি হল

এক: রুগী সংক্রান্ত তথ্য—বয়েস, লিঙ্গ (নাম গোপন রাখা হবে);

দুই: অঘটনের সময়;

তিন: অঘটনের স্থান বা অকুস্থল;

চার: অঘটনের কারণ;

পাঁচ: যে উপাদানগুলি অঘটন ঘটতে সাহায্য করেছে;

ছয়: যে উপাদানগুলো অঘটন ঘটা আটকাতে পারত;

সাত: কী ধরনের অঘটন;

আট: অঘটনের ফলাফল;

নয়: অঘটন ঘটার ফলে যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হল;

দশ: এই প্রতিবেদনের প্রতিবেদক-এর ভূমিকা।

কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। আরও যেসব জরুরি কাজ করতে হবে সেগুলি হল: তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণা; বিভিন্ন নির্দেশিকা ও গাইডলাইন তৈরি; কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর প্রশিক্ষণ; অন্যান্য দপ্তরের সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা; স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান বা পরিকল্পনা তৈরি ইত্যাদি। সবশেষে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে তাদের উপযোগী একটি কোয়ালিটি অ্যাসিয়োরেন্স প্রোগ্রাম বা উৎকর্ষ সাধনের কর্মসূচি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, যেই কর্মসূচিতে রুগীর সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

এই কাজগুলি করার জন্য চিকিৎসকদের পাশাপাশি হাসপাতালকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত কর্মচারীদের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। ওয়ার্ড বয়কেও প্রশিক্ষিত হতে হবে হাসপাতালের পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে। একা কোনো একজন বা একদল চিকিৎসক এই কাজ পারবেন না।

লিবির গল্পটা তো শেষ হয়নি। গল্পটাতে ফেরা যাক। নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ কমিশন ডা. বাট্রান্ড বেল-এর নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে। জুনিয়র ডাক্তারদের ডিউটির সময়সীমা, তাদের একটানা ডিউটির ক্লান্তি, সিনিয়র ডাক্তার দিয়ে তাদের কাজকর্মের তদারকি, ওষুধপত্র লেখার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে ওই কমিটি একটি প্রতিবেদন পেশ করে।

প্রণয়ন করা হয় নতুন আইন যেখানে কঠোরভাবে ওই কমিটির সুপারিশগুলি মেনে চলার কথা বলা হয়। আইনের কেতাবে ওই আইনটির পোশাকি নাম হল নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ কোড সেকশন ৪০৫ আর ডাকনাম হল "লিবি জিওন ল"। আজ আর কোনো জুনিয়র ডাক্তারকে ওই দেশে একটানা ৩৬ ঘণ্টা ডিউটি করতে হয় না।

আমাদের দেশে কতশত লিবি জিওন অকালে বিদায় নিচ্ছে। সবার বাবা তো আর *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর লেখক হন না যে একার জোরে জনমত তৈরি করে ফেলবেন। সব্বাইকে এগিয়ে আসতে হবে ভবিষ্যতের লিবিদের বাঁচাতে।

আমরা, চিকিৎসকরা পাশে আছি। আমরাও আর কোনো লিবিকে

এই কাজগুলি করার জন্য চিকিৎসকদের পাশাপাশি হাসপাতালকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত কর্মচারীদের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

হারাতে চাই না।

সূত্র ১: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এইচ আই এস-এস ডি এস ২০১৬.২২

সূত্র ২: *ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল*, ২০১৩ (১০): এ কে ঝা, আই ল্যারজীগয়টিয়া, সি আউদেররা-লোপেজ ও সহযোগী, পৃষ্ঠা ৮০৯-১৫

সূত্র ৩: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এইচ আই এস-এস ডি এস ২০১৭.১৫

সূত্র ৪: রুট কজ অ্যানালিসিস পেশেন্ট সেফটি প্রাইমার—ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিস

সূত্র ৫: *এ কেস দ্যাট সুক মেডিসিন*, ব্যারণ এইচ লার্নার, ওয়াশিংটন পোস্ট, নভেম্বর ১৮, ২০০৬। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, ডিপিএইচ, স্বাস্থ্য প্রশাসক।

ঝাড়গ্রামে শবর মৃত্যু

পিয়ালী দে বিশ্বাস

চিত্র ১.শবর পরিবার

পূর্ণপানি গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের বিনপুর ২ নং ব্লকে। কিছুদিন আগেই সে গ্রামে ৭ জন শবরের মৃত্যু গ্রামটিকে খবরের শিরোনামে এনেছিল। এ পি ডি আর-এর নৈহাটি শাখার এক তদন্তদল গ্রামটির প্রকৃত অবস্থা দেখতে গিয়েছিল ২ সপ্তাহ আগে। গ্রাম ঘুরে তাঁরা অনুভব করেছিলেন স্থানীয় মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ওই জায়গায় একটি মেডিক্যাল টিমের যাওয়া উচিত। গত ২৭ নভেম্বর ৪ সদস্যের একটি মেডিক্যাল টিম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পূর্ণপানিতে। সাংবাদিকসুলভ কৌতূহলের বশেই আমিও চিকিৎসক ও হেলথ ওয়ার্কারদের সঙ্গী হই। ব্যবস্থাপনায় ছিল এ পি ডি আর ঝাড়গ্রাম শাখা ও খেরিয়া শবর কল্যাণ সমিতি। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পরেই শবরদের জন্য সপ্তাহে মাথাপিছু ২ কেজি চাল দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। তবে এত মৃত্যু কেন? যদিও ঘটনার পর থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম, সরকারি তরফে মেডিক্যাল পরিষেবা ও অঙ্গনওয়াড়ি

মাথাপিছু ধরে এক সপ্তাহে তাঁদের পাওয়ার কথা ২২ কেজি চাল। কিন্তু তার বদলে পাচ্ছেন ১০-১২ কেজি। তাঁদের হকের আরও ১০ কেজি চাল কোথায় যাচ্ছে, উত্তরটা জানা নেই...

কর্মীদের মাধ্যমে নিয়মিত দু-বেলা খাবার দেওয়া হচ্ছে শবরদের পরিবারগুলিকে।

গিয়ে কী দেখলাম? ওই কয়েক ঘণ্টা শবরদের সঙ্গে কথা বলে মনে হল সমস্যাটা খাদ্যের, সমস্যাটা কর্মসংস্থানের।

পূর্ণপানি গ্রামের একটি পাড়ায় অল্পসংখ্যক মাহাতোদের বাস। অন্য পাড়ায় ৩৫টি শবর পরিবারের বাস। পূর্ণপানি ছাড়াও বিনপুরে করমশোল ও রাইতোড় নামে আরও দু-টি শবর গ্রাম আছে। পূর্ণপানিতে বসবাসকারী শবরদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই অশিক্ষিত। বর্তমানের ৩ প্রজন্ম অর্থাৎ এখন যাঁরা দাদু, যাঁরা বাবা ও তাঁদের সন্তানদের মধ্যে শুধু শিশুরাই পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। গ্রামের মধ্যে কম-বেশি সবাই সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী। ১২ থেকে ১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেকেই পড়াশোনা করে। বেশিরভাগ শিশুরাই স্কুলে যাচ্ছে। তবে এর পিছনে সরকারের দেওয়া মিড ডে মিলের বড়ো ভূমিকা আছে। ২০১৩-র পর থেকে প্রত্যেক শবরের রেশনকার্ড হয়েছে, তাতে সপ্তাহে ২ কেজি করে চাল পাওয়ার কথা। কিন্তু পাচ্ছেন কি? কথা বলে জানা গেল কোনো বাড়িতে হয়তো সব মিলিয়ে ১১ জন সদস্য। মাথাপিছু ধরে এক সপ্তাহে তাঁদের পাওয়ার কথা ২২ কেজি চাল। কিন্তু তার বদলে পাচ্ছেন ১০-১২ কেজি। তাঁদের হকের আরও ১০ কেজি চাল কোথায় যাচ্ছে, উত্তরটা জানা নেই শবর পরিবারগুলির। তা শবরেরা কাজ-কারবার না করে সারা মাস কি কেবল সরকারের

নিয়ম অনুযায়ী যেখানে শ্রমিকের ন্যূনতম পারিশ্রমিক হওয়ার কথা ২৪৪ টাকা, সেখানে রোজ হিসাবে ১৩০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা পান।

দেওয়া চালেই তাঁদের পেট ভরাবে? সংগত প্রশ্ন। এবার দেখা যাক কর্মসংস্থানের কী অবস্থা ওই এলাকায়। আর কিছু না হোক ১০০ দিনের প্রকল্প তো চলেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ১০০ দিনের কাজের জবকার্ড যাঁদের আছে, তাঁদের পরিবার পিছু বছরে ২০-২২ দিনের বেশি কাজ কেউই পায় না। নিয়ম অনুযায়ী যেখানে শ্রমিকের ন্যূনতম পারিশ্রমিক হওয়ার কথা ২৪৪ টাকা, সেখানে রোজ হিসাবে ১৩০ টাকা থেকে ১৪০ টাকা পান। আচ্ছা, গ্রাম্য এলাকায় চাষ-আবাদ তো হয় নিশ্চয়ই, তা থেকেও তো রোজগার করা যায়? না, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি বিনপুর জঙ্গলের ধারে লালমাটির রুক্ষ এলাকা, চাষের জমি হাতে গোনা। এক

ফসলি ওই জমিতে শুধু আমন ধানের চাষই হয়। সেই ধান জমিতে রোয়া ও কাটাই-এর সময়েই কাজ পায় শবরেরা। সবমিলিয়ে বছরে ২০-২২ দিন চাষের কাজে ব্যস্ত থাকে শবরেরা। বাকি সময় বন থেকে জ্বালানি কাঠ বা বনজ সামগ্রী সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেই তাঁদের পেট চলে। এই পরিস্থিতিতে অনাহারে মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বলা হচ্ছে শবরেরা নাকি খাবার ফেলে মদ খায়, ওষুধ দিলেও তা ফেলে দেয়। চিকিৎসক নিয়ে পূর্ণপানিতে যাওয়ার পর গ্রামের সবাইকে বলা হল একে একে এসে তাঁদের সমস্যা চিকিৎসকদের বলতে। আমরা গ্রামে পৌঁছেছিলাম বেলা ১২টার দিকে। ওই সময় শবরেরা সাধারণত জঙ্গলে যায় কাঠ সংগ্রহ করতে। বাকি যাঁরা গ্রামে ছিলেন, তাঁদের কাছে ডাক্তারের বসবার জন্য চেয়ার ও টেবিল চাওয়া হয়েছিল, সারা গ্রাম খুঁজেও কোনো টেবিল পাওয়া যায়নি, তবে প্লাস্টিকের দুটো চেয়ার জুটেছিল। ডাক্তার দেখানোর জন্য আসা বেশিরভাগ শিশুরই কমন সমস্যা সর্দি-কাশি, তাঁদের কয়েকজনের মধ্যে অ্যাজমা বা হাঁপানির প্রবণতাও পাওয়া গেল। বেশিরভাগ শিশুই আন্ডারওয়েট। সাহিত্যে ট্রাইবাল রমণীর দেহসুষমা নিয়ে অনেক বর্ণনা পড়েছি। এক্ষেত্রে দেখলাম, সম্পূর্ণ উলটো ছবি। পূর্ণবয়স্ক হয়েও বেশিরভাগ মহিলার ওজন ৩৫ থেকে ৪০ কেজির মধ্যে। কষ্টসাধ্য জীবন, অল্প বয়সে বিয়ে, সেইসঙ্গে পরপর ৩ থেকে ৪টি সন্তানের জন্ম দিয়ে অনেকেই সময়ের আগে বুড়িয়ে গিয়েছেন। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজে থেকে এগিয়ে এসে তাঁদের মাসিকের ও সাদা

চিত্র ২. পূর্ণপানি শবর গ্রামে হেলথ ক্যাম্পের একটি দৃশ্য

স্রাবের সমস্যার কথা বললেন। ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ বুঝে নিয়ে পাড়ার অন্যদেরকেও খবর দিলেন। অথচ আমরা শহরে বসে শুনেছিলাম, এঁরা নাকি ওষুধ ফেলে দেন। আগে পূর্ণপানির বেশিরভাগ শিশুরই জন্ম হত ঘরে। তবে এখন ছবিটা বদলেছে, সন্তান প্রসবের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাচ্ছেন শবর পরিবারের হবু মায়েরা। গত ২-৩ বছর ধরে তাঁদের নিজস্ব চেষ্টায় ম্যাজিক ঘটিয়েছেন আশা কর্মীরা। মাতৃত্বের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাজনক দিকগুলি তাঁদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন তাঁরা। এখন সন্তান বাড়িতে প্রসব হলেও তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেও অনেকেরই কোমরে ও হাঁটুতে সমস্যা পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকের মধ্যেই চর্মরোগের প্রকোপ দেখলাম। সেই তুলনায় সুগার বা প্রেশারের মতো ক্রনিক রোগ তুলনামূলকভাবে কম। তবে চিকিৎসা করাতে আসা অনেকের গা থেকে দেশি মদের গন্ধ পেয়েছি। কলকাতা থেকে আসার আগে শুনেছিলাম শবরদের মৃত্যুর পর গ্রামে নাকি সরকারি উদ্যোগে হেলথ ক্যাম্প করা হচ্ছে, যদিও আমরা গিয়ে তার চিহ্ন পেলাম না। শবরদের মুখেই শুনলাম, স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে একটি এনজিও 'মান্ট'-এর পক্ষ থেকে মোবাইল মেডিক্যাল টিম নিয়ে সপ্তাহে একদিন দু-ঘণ্টা ক্যাম্প চালানো হয়। আর কয়েক কিলোমিটার দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রই প্রধান ভরসা শবরদের। আরও বড়ো কিছু হলে তাঁদের যেতে হয় ঝাড়গ্রামের সরকারি হাসপাতালে।

তবে উন্নয়ন কি কিছুই হয়নি? সরকার পরিবর্তনের পর গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল পূর্ণপানি গ্রামে। মানুষদের সুবিধার জন্য গ্রামের মাঝখানে একটি কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। আগে মাটির এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ছিল, এখন সেখানে পিচ ঢালা রাস্তায় শহুরে গাড়ি চলছে।

খেড়িয়া শবর সমিতির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সরকারি তরফে চেষ্টা করা হয়েছিল অন্য গ্রামের মতন পূর্ণপানিতেও স্বনির্ভর প্রকল্প গড়ে তোলার। কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে নিজেদের জীবনযাত্রা। স্বনির্ভর প্রকল্প বা অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সাহায্য নিতে গেলে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্কে যেতে হয়। ব্যাঙ্কগুলি শবরদের গ্রামের থেকে কমবেশি ১০-১২ কিলোমিটার দূরে। ওই সময়ে তাঁরা হয়তো জঙ্গলে যায় কাঠ সংগ্রহের জন্য। যা তাঁদের অন্যতম জীবিকা। ফলে সময়মতো ব্যাঙ্কে যাওয়া বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে আগ্রহী হন না এঁরা। তবে খেড়িয়া শবর সমিতির পক্ষ থেকে পড়াশোনা জানা ছোটোদেরকে এইসব বিষয়ে আগ্রহী করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এরমধ্যেও আশার আলো আছে। পূর্ণপানির পাশের গ্রাম করমশোলে পড়াশোনা শিখে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাজ পেয়েছেন পুষ্পা শবর। তাঁকে দেখেই অনেকেই আশায় বুক বেঁধেছেন, হয়তো একদিন পূর্ণপানির এই অবহেলার ইতিহাস মুছে দিয়ে নতুন ইতিহাস লিখবে পূর্ণপানির শবর সন্তানেরা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

প্রথম প্রকাশ http://www.thepeopletv.com/state/jhargram-shabar-death-a-inner-report-of-ngo/.

লেখক একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজের সাংবাদিক।

বেসরকারি হাতে সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

২০১৮-র অক্টোবরের শুরুর খবর

শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দায়িত্ব দেওয়া হল জিন্দাল গ্রুপকে। এ-বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে রাজ্য সরকার এই মর্মে একটি মউ স্বাক্ষর করে। যেখানে উল্লেখ আছে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটিকে যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রসহ তুলে দেওয়া হচ্ছে জে এস ডব্লিউ গ্রুপের হাতে।

স্বাক্ষরিত মউ অনুযায়ী শুধুমাত্র হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অবস্থিত বি এম ও এইচ অফিস বাদে বাকি সবটুকুর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জিন্দাল গ্রুপের হাতে। হাসপাতালের আউটডোর, ইনডোর, শল্যচিকিৎসা থেকে পরীক্ষানিরীক্ষা সবকিছুই চালাবেন এই গোষ্ঠী। এমনকী নার্স এবং অন্য চিকিৎসাকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের দায়িত্বও তাঁদের। রুগী পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসাকর্মীও নিয়োগ করবেন তাঁরা। এতদিন সরকারি হাসপাতাল হওয়ার কারণে এই হাসপাতালের সব পরিষেবাই বিনামূল্যে ছিল, কিন্তু এবার থেকে হাসপাতালের মোট ২৫ শতাংশ বেডে ভর্তি হতে হবে পয়সা দিয়ে। এই পেইং বেডগুলি শুধুমাত্র কর্পোরেট সংস্থাগুলি যে রুগীদের খরচ বহন করবে, যাঁদের বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা আছে এমন রুগী ও এসি কেবিনে থাকতে চান এমন রুগীদের জন্যই বরাদ্দ করা হবে। পেইং বেডগুলির জন্য হাসপাতালের মধ্যে একটি পৃথক বিল্ডিং তৈরি করা হবে, যার প্রবেশপথও হবে ভিন্ন। পরিষেবার জন্য অর্থ বরাদ্দ করবে জে এস ডব্লিউ ফাউন্ডেশনই।

রাজ্য সরকার বর্তমানে চিকিৎসাক্ষেত্রে পি পি পি মডেলে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে (অপারেট অ্যান্ড ম্যানেজ পদ্ধতি) পি পি পি মডেল অনুসরণ করে একটি সম্পূর্ণ হাসপাতাল বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনা এ-রাজ্যে প্রথম। তবে স্বাস্থ্যসাথী, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেলথ স্কিম, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম, ই এস আই ইত্যাদি সরকারি স্বাস্থ্যবিমাগুলির পরিষেবা মিলবে ওই হাসপাতালে।

—পিয়ালী দে বিশ্বাস।

এক ডাক্তার লিখলেন—

হাতবদল হয়ে যাচ্ছে শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। আর একবার বলছি, হাতবদল হয়ে যাচ্ছে একটা জলজ্যান্ত সরকারি হাসপাতাল।

এই হাসপাতালের ওপর জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ নির্ভরশীল ছিলেন। বিগত কয়েক বছরে এলাকার গরিব (মূলত আদিবাসী) মানুষের আশা-ভরসার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই হাসপাতাল। সেই হাসপাতাল এবার চলে যাচ্ছে জিন্দাল গোষ্ঠীর কাছে।

শেষ বছর দুয়েক সময়ে প্রচুর স্পেশালিস্ট ডাক্তার এই হাসপাতালের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। রমরমিয়ে শুরু হয়েছিল আলাদা শিশু বিভাগ। ফল মিলেছিল অচিরেই। বেশ কয়েকবার উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সংবাদপত্রের শিরোনামে উঠে এসেছিল এই হাসপাতাল।

সিজারিয়ান সেকশন শুরু হয় মাস ছয়েক আগে। তাছাড়া চোখ, নাক-কান-গলা, মেডিসিন, সার্জারি, মানসিক রোগ, নিউরোসার্জারি, শিশু, দন্ত, অ্যানাস্থেশিয়া ইত্যাদি অনেকগুলি বিভাগের বহির্বিভাগ পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়। পেশেন্ট সংখ্যা প্রায় তিন-চার গুণ হয়ে যায়।

সেই হাসপাতাল হস্তান্তরের খবরে স্বভাবতই আতঙ্কে দিন গুনছে জঙ্গলমহল। আপাতত মুখে ৭৫ শতাংশ বেড বিনে পয়সায় দেওয়ার কথা বললেও চিকিৎসাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের কুফল নিয়ে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে যথাযথ পরিষেবা পাওয়া যাবে কিনা সে নিয়ে মানুষ রীতিমতো সন্দিহান।

আরও একটি ভেবে দেখার মতো বিষয়। সবাই জানেন, এ-রাজ্যে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক, বিশেষত স্পেশালিস্ট চিকিৎসক অপ্রতুল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কিছু ডাক্তার জানিয়েছেন, এই হাসপাতাল উঠিয়ে তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে দিলে তাঁরা চাকরি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। অনেক ডাক্তারের সাথেই এই এলাকার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বিগত কয়েক বছরে। হাসপাতাল বেসরকারিকরণ এবং তার ফলস্বরূপ বেশ কিছু ডাক্তারের চাকরি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া গোদের ওপর বিষফোঁড়া হতে যাচ্ছে বলেই এলাকার মানুষের ধারণা। এর দায় কে নেবে?

ইতিমধ্যেই চিকিৎসায় এর প্রভাব পড়া শুরু হয়ে গেছে। সরকারের তরফে নতুন ওষুধপত্র আসা বন্ধ হয়ে গেছে। অলিখিত নিয়মে রোগী ভর্তির হারও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে ডাক্তারবাবুরা এতদিন মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতেন তাঁরাও আর কাজ করার তাগিদ অনুভব করছেন না। ফলে ভুগছে সাধারণ মানুষ।

পুরো ব্যাপারটাই হয়েছে সবার অগোচরে। মিডিয়ার তৎপরতাও দেখা যায়নি। হাসপাতালের ডাক্তার/নার্সরাও পুরোপুরি ধোঁয়াশায়।

মাঝখান থেকে পুকুর চুরির মতো একটা জলজ্যান্ত সরকারি হাসপাতাল মাঝখান থেকে হাতবদল হয়ে যাচ্ছে।

শালবনী চলো

শালবনী চলোর ডাক দিয়েছিল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টরস। ১ ডিসেম্বর জয়েন্ট প্ল্যাটফর্মের পক্ষে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরামের ৩ জন, অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ সার্ভিস ডক্টর্স-এর ৪ জন এবং শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ১ জন প্রতিনিধি শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার এবং শালবনীর ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতাল হস্তান্তরের বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুরের চিফ মেডিক্যাল অফিসার অব হেলথকে লেখা একটি প্রতিবাদপত্র দেন। প্রতিনিধি দল চিকিৎসক, রোগী এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন। ফেরার সময় মেদিনীপুরে সি এম ও এইচ-এর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আগমনীর প্রস্তুতি সভায় ব্যস্ত ছিলেন।

শালবনী থেকে ফিরে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক লেখেন—

শালবনী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দু-টি বিল্ডিং—একটি সাজানো-গোছানো সুয়োরানির বহুতল নীল সাদা বিল্ডিং, আরেক দিকে গরিবের একতলা, খোয়া ধরা, পলেস্তারা খসা বাড়ি। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার আর সুপারিন্টেডেন্টের ঘর এই গরিবের সংসারে। সুয়োরানি এখন জিন্দালদের সম্পত্তি। কারণ, রাজ্য সরকার জনসাধারণের অর্থে নির্মিত এই ইমারত, তার যন্ত্রপাতির মায় আসবাবপত্রর মালিকানাস্বত্ব বিনা শর্তে দান করেছে। মোট ৪৩টি সুপার স্পেশালিটির মধ্যে এই হাসপাতালটি ছিল এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যা সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। হাসপাতাল বহির্বিভাগে ১১০০ রোগী, দৈনিক ১০টি প্রসব, ৫টি সিজারিয়ান ডেলিভারিসহ চিকিৎসকরা মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সুরাহা করতে সদা ব্যস্ত। সার্জিক্যাল ওটিতে কাজ চলছিল যথাযথ। শিশুবিভাগে রেফার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য অন্য হাসপাতাল থেকে রোগী রেফার হচ্ছিল। সফল হাসপাতালের বিজয়কেতন উড়িয়ে পরিশ্রমী চিকিৎসকরা এটিকে সত্যিকার আরোগ্য নিকেতনের রূপ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেই সুখের সংসারে বাদ সাধল মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা। জিন্দাল গোষ্ঠীর সিমেন্ট কারখানার স্বার্থে মা-মাটি-মানুষের সোল প্রোপ্রাইটার এই হাসপাতালের পুরো পরিকাঠামো 'জিন্দাল'-কে দান করেছেন। গিরি গোবর্ধন ধারণ করার জন্য শিল্পপতির কোনো প্রতিনিধি নির্দিষ্ট দিনে হাজির হননি কিন্তু ডিক্রি জারি হয়েছে, পরোয়ানা যেকোনো দিন চলে আসতে পারে। সেই পরোয়ানা চালু হলে এলাকার খেটে-খাওয়া নিরন্ন মানুষের শেষ অবলম্বনটুকুও চলে যাবে, তাঁরা ইতিমধ্যেই এ-হাসপাতাল এড়িয়ে যেতে শুরু করেছেন। বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা এক ধাক্কায় কমে এক-চতুর্থাংশ হয়ে গেছে—১১০০ থেকে ৩৩০, প্রসূতি মায়ের সংখ্যা দশ থেকে ছয়ে নেমে এসেছে। বিনা পয়সায় আর ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর শতকরা ২৫ভাগ শয্যায় যেমন খুশি ফি নেওয়া যাবে। হাসপাতাল পুঁজিপতির হাতে চলে যাবার খবর শুনেই গরিবের হৃদ্‌কম্প শুরু হয়েছে—তাই তাঁরা সযত্নে এই হাসপাতাল এড়িয়ে চলছেন।

এই হাসপাতাল যাঁরা সন্তান স্নেহে পরিচালনা করছিলেন সেই চিকিৎসকরা মনে করেন এই হস্তান্তর প্রকৃতপক্ষে ডাইনির হাতে একমাত্র সন্তান সমর্পণের মতোই বেদনাদায়ক। ক্ষুব্ধ চিকিৎসক ও প্রশাসকরা মুখে যাই বলুন, তাঁদের মুখে-চোখে লেখা আছে বেদনার ইতিহাস। তাঁরা বুঝতেই পারছেন না তাঁদের শ্রমে মানুষের আস্থা অর্জনে সফল একটি সুন্দর পরিকাঠামো দিনের আলোয় এভাবে লুট হয়ে যেতে পারে। এলাকার মানুষও ফুঁসছেন—ইতিমধ্যে আদিবাসী সংগঠনের পক্ষে এখানে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। কিন্তু জগদ্দল সরকারের তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, বিশ্ববঙ্গের মালিকের মুখের উপর কথা বলার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু, আমরা সাধারণ মানুষ, যাদের পয়সা নিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলের থেকে হরির লুটের ব্যবস্থা হয়েছ তারাও কি নীরব থাকব? এই বাংলার মাটি একদিন দরিদ্র মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করেছেন। সেই পবিত্র ভূমি আজ যদি বিনা প্রতিবাদে লুটেরার হাতে চলে যায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না। জিন্দাল গোষ্ঠী তার হাসপাতাল যেখানে খুশি বানাতে পারে, কিন্তু গরিবের কষ্টার্জিত সম্পত্তি কোনোমতেই কারও হাতে তুলে দিতে দেওয়া যাবে না। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে আবার সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে।

—ডা. রেজাউল করিম।

অবশেষে

৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ মেদিনীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় ভাষণের অনেকটা জুড়ে ছিল শালবনী . . . শালবনী হাসপাতাল সরকার জিন্দলদের দেয়নি, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির অন্তর্গত হাসপাতালটিকে কেবল চালাবে তারা, যারা জয়েন্ট প্ল্যাটফর্মের হয়ে গিয়েছিলেন তারা ডাক্তার হলেও ফাঁকিবাজ ডাক্তার, মিথ্যা কথা বলা তাদের কাজ . . .

জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার পরে হাসপাতালে রোগীর আনাগোনা বেড়েছে, সরকারি ওষুধের সরবরাহও বেড়েছে . . .।

বই পড়া

অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও ভাবাদর্শের ফসল

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

ডা. পুণ্যব্রত গুণ, *পা মিলিয়ে পথ চলা*, কথাশিল্প, জানুয়ারি ২০১৮, মূল্য ২০০ টাকা

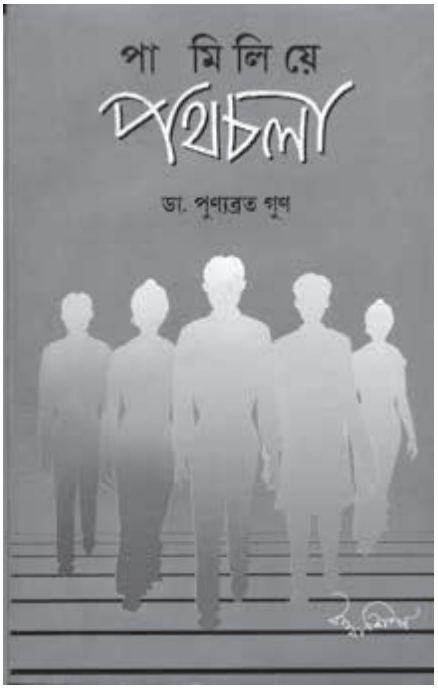

বইটির শুরুতেই লেখক জানিয়ে দিয়েছেন, কেন তিনি ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। গড়পড়তা ডাক্তারি পড়তে চাওয়া মধ্যকোটির মানুষের থেকে এখানেই তিনি স্বতন্ত্র হয়ে যান। এখনও পর্যন্ত এই স্বাতন্ত্র্য তিনি বজায় রেখে চলেছেন। বিপুল রোজগারের আকাঙ্ক্ষা না করে, যে গরিব মানুষজন চিকিৎসা করানোর সুযোগই পান না, ডাক্তার হিসেবে তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসিদ্ধ চিকিৎসা দানের ব্রতে তিনি নিয়োজিত। একজন ডাক্তার একজন স্বাস্থ্যকর্মীও বটে। সেজন্যে তিনি আমজনতার চিকিৎসা ব্যতীত স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য দিকগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না; আর তাই তাঁর স্বাস্থ্য আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া। এইসব কারণেই তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভেতর যে ভাবাদর্শ ফুটে ওঠে তা পড়ুয়াদের পর্যবেক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বইটির প্রথম অংশের বিষয় স্বাস্থ্য আন্দোলন। বারোটি নিবন্ধে তিনি তাঁর সময়ের স্বাস্থ্য আন্দোলনের নানা দিক তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন, ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার, ভোপাল আন্দোলন ও দল্লী-রাজহরার জনস্বাস্থ্য আন্দোলন ও শহীদ হাসপাতাল—এই চারটি নিবন্ধ স্বাস্থ্য আন্দোলনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নথি হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণত কোনো পেশায় ট্রেড ইউনিয়নগতভাবে কর্মীদের আর্থিক দাবিদাওয়াই গুরুত্ব পায় ও সেই দাবি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নানারকম দর কষাকষি চলে। সেক্ষেত্রে জুনিয়র ডাক্তারদের মূল দাবিগুলো আমাদের চমকে দেয়। সেখানে নিজেদের আর্থিক সুবিধা পাওয়ার কোনো কথা নেই। বদলে আছে সাধারণ মানুষের অধিকারের দাবি—স্বাস্থ্যের অধিকারকে নাগরিকের 'মৌলিক অধিকার' রূপে স্বীকৃতি দিতে হবে। দাবির এই অভিনবত্ব প্রথম থেকেই জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে একটা অন্য মাত্রা দেয়।

১৯৮০-র দশক থেকে শুরু হওয়া ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের আন্দোলন আজও সমানে চলছে। তার খুঁটিনাটি বিবরণ এই নিবন্ধে ধরা আছে। ভোপালের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে লেখকের যোগদান গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে মেডিক্যাল কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি সরাসরি চলে যান ভোপালে। যথাযথ চিকিৎসার দাবিতে ভোপালবাসীদের আন্দোলন লেখক ও তাঁর সহযোগীদের পথ-প্রদর্শক রূপে কাজ করে গেছে।

দল্লী-রাজহরায় কাজ করার সময়ে, আট বছরে লেখক ভাবাদর্শগতভাবে অনেক বেশি পরিণত হয়ে ওঠেন শ্রমিক নেতা শংকর গুহনিয়োগীর সংস্পর্শে এসে। সরাসরি খনিমজুরদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে যাওয়ার ফলে তাঁর ভেতর মধ্যকোটিসুলভ অনেক ছুঁতমার্গ কেটে যায়। গুহনিয়োগীর 'সংঘর্ষ ও নির্মাণ'-এর তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ ভারতের সব ধরনের গণ-আন্দোলনের (শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুব, মহিলা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি) ক্ষেত্রে আজও প্রাসঙ্গিক। লেখক যেহেতু স্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রধানত যুক্ত ছিলেন, সেহেতু তিনি দল্লী-রাজহরার জনস্বাস্থ্য আন্দোলন ও শহীদ হাসপাতাল নিয়ে এই বইতে বিশদে আলোচনা করেছেন। আর্থিক দাবিদাওয়াই ট্রেড ইউনিয়নের একমাত্র কাজ হতে পারে না। মজদুর-কৃষকদের মধ্যে একটা সুস্থ বিকাশশীল জীবনবোধ চারিয়ে দেওয়াও তার অন্যতম

প্রধান কাজ। এই বোধেই প্রণোদিত হয়ে দল্লী-রাজহরায় সাফাই আন্দোলন, শরাব-বন্দি আন্দোলন স্থানীয় মজুর-কৃষকদের চেতনায় এক গভীর ছাপ ফেলেছিল। জনস্বাস্থ্য আন্দোলন বিকশিত হতে থাকলে পুরোপুরি মজদুরদের অর্থে গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। শহীদ হাসপাতালের চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়ে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁরা যেভাবে ব্লাড ব্যাঙ্ক চালাতেন তাতে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। যদিও এখন ব্লাড ব্যাঙ্ক চালানোর নিয়মকানুন মেনে সেভাবে আর ব্লাড ব্যাঙ্ক চালানো যায় না। রক্তের দরকার পড়লেই স্বেচ্ছা-রক্তদাতারা এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে হাজির। এমন মানসিকতা এ-সময়ের 'রক্তদান শিবির'-এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে দেখা যায় কি! লেখক শহীদ হাসপাতালের সীমাবদ্ধতা, কিছু কিছু অপারগতা নিয়েও খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। গুহনিয়োগীর জীবনাবসানের অনতিকাল পরেই হাসপাতাল যে ধীরে ধীরে আদর্শবিচ্যুত হয়েছিল, তাও জানিয়েছেন; কোনো লুকোছাপা করেননি। তবুও তিনি আশা রাখেন, শহীদ হাসপাতাল আদর্শগতভাবে ফের উঠে দাঁড়াতে পারবে।

পরবর্তীতে কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিক আন্দোলনের স্বাস্থ্য কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত হয়ে গড়ে উঠল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কিছু পরে লেখকদেরই প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ। এঁরা খুব কম খরচে গরিব মানুষের বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসিদ্ধ চিকিৎসা করেন। সমসময়ে কিছু আগে পরে একইরকম আরও কিছু স্বাস্থ্য সংগঠন গড়ে অঠে—বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরবেড়িয়ায় সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, মদন মুখার্জী স্মৃতি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রভৃতি। এর সব ক-টির সঙ্গেই লেখক কোনো-না-কোনো সময়ে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৮-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'র ডাক দিয়েছিল। যে সনদে ভারতও একটি স্বাক্ষরকারী দেশ। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই লেখক ও তাঁর সহযোগীরা এইসব চিকিৎসা সংস্থার কাজের মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে এত কম খরচে যখন চিকিৎসা সম্ভব তখন রাষ্ট্র কেন 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'র দায় নেবে না। তবে ভারত রাষ্ট্র খাতায়-কলমে ভালো ভালো কথায় সইসাবুদ করলেও তাদের যে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ কোনো মাথাব্যথা নেই বরং স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের পকেট বোঝাই করতেই তারা অনেক বেশি বদ্ধপরিকর—তার প্রমাণ তারা আজও দিয়ে চলেছে। লেখক ও তাঁর সহযোগীরা অবশ্য একটুও হাল না ছেড়ে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'র দাবির পাশাপাশি এই চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো আজও সমান উদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছেন।

দেশি-বিদেশি ফান্ডে পুষ্ট এন জি ও-দের মধ্যে কাজ করা নিয়ে লেখকের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। তাঁর ধারণা শেষ বিচারে অধিকাংশ এন জি ও দেশি-বিদেশি নানা শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

বইটির দ্বিতীয় অংশে চিকিৎসক রূপে তাঁর অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। হেপাটাইটিস বি যে স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি গুরুতর পেশাগত সমস্যা, তার পরিচয় মেলে 'রুদ্রানন্দ বাঁচেনি' নিবন্ধে। ওআরএস বা পুনর্জলন দ্রবণ সম্পর্কে সাধারণভাবে তৎকালীন ডাক্তারদের অজ্ঞতা কীভাবে অকারণে একটি শিশুর মৃত্যু ঘটিয়েছিল; আমরা তা জানতে পারি 'ডায়রিয়ায় ভুল চিকিৎসায় শিশুর মৃত্যু' রচনায়। মেডিক্যাল ছাত্রদের সিলেবাসেও যে এ-বিষয়ে তেমন কোনো গুরুত্ব দেওয়া হত না, সেটাও জানা যায়। 'সুরেখা মারা গেল' থেকে জানতে পারি মারণ রোগ জলাতঙ্কের হাত থেকে গরিব মানুষের কোনো রেহাই নেই। দুধের বাচ্চার পুষ্টি কীভাবে আসে সেটা না জানার ফলে এদেশের বহু মায়ের কোল খালি হয়ে যায়; তার কথা জানতে পারি 'শিউকুমার কেন অসুস্থ' লেখাটা থেকে। একইসঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শে ঠিকভাবে দুধ তৈরি করে শিশুকে খাওয়ানোর ফলে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

এক্টোপিক প্রেগন্যান্সির এক রোগিণী চিকিৎসকের ভুলে মারা গিয়েছিলেন। লেখকের নৈতিকতা বোধ এতটাই জোরালো যে তিনি সে কথা সর্বসমক্ষে স্বীকার করার সাহস দেখাতে পারেন। একালের নিরিখে ডাক্তারের এমন স্বচ্ছ মানসিকতা বিরল। আবার ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তিনিই কুড়ি বছর আগে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগসুবিধাবিহীন খনি শহরে আর-এক এক্টোপিক প্রেগন্যান্সির রোগিণীর প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিলেন। পেপটিক আলসার পারফোরেশন-এর এক রোগীকে এক্স-রে না করেই পারকাশন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে অপারেশন করে ফুটো বন্ধ করে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। অন্ত্রের কোনো অংশ পচে গেলে সেটি কেটে বাদ দিয়ে অন্ত্রের সুস্থ দু-টি প্রান্ত সেলাই করে জুড়ে দিতে হয়—এই অপারেশনের পোশাকি নাম রিসেকশন-অ্যানাস্টোমোসিস। এর জন্য বেশ কিছু যন্ত্রপাতি লাগে। শহীদ হাসপাতালে সেসব কিছুই ছিল না। তবুও তিনি হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই দিয়েই অপারেশনটি করে ফেললেন। শিশুটি বেঁচে গেল।

চিকিৎসা করতে গিয়ে সমাজের নানা আর্থিক স্তর বিভাজন, জীবনযাপনের বিচিত্র ধরন তাঁর নজর এড়ায়নি। সেজন্যেই সন্ন্যাসীর জ্বর সারিয়েও তাঁর মনে প্রশ্ন থেকে যায়: ওঁর জীবনযাপন সারাবে কে? জোবেদা বেওয়ার কিডনিতে পাথর হয়েছে। লেখক পরীক্ষানিরীক্ষা করে জোবেদাকে সরকারি হাসপাতালে পাঠালেন। হাসপাতালে ডেটের পর ডেট পড়ে। একদিন জোবেদার ছোটো ছেলে হাসপাতালের কাগজপত্র হারিয়ে ফেলে। জোবেদারও অপারেশন করার আগ্রহ ফুরিয়ে যায়। কার কাছে ওঁর বড়ো বউমা শুনেছে যে কে নাকি অপারেশন না করেই পেটে মাটি মাখিয়ে পাথর বার করে আনতে পারে। ওঁরা ছুটলেন সেখানে। একটা গোলগাল নুড়ি পাথর বেরোল; পকেট থেকে টাকাও বেরিয়ে গেল অনেক। পরে জোবেদা যখন দেখাতে

আসেন; লেখক যত বলেন এভাবে পাথর বেরোতে পারে না; জোবেদার বিশ্বাসই হয় না। জোবেদা আর অপারেশন করাননি; ঠিক করেছেন, কিডনিতে পাথর নিয়েই তিনি ধরাধাম ছেড়ে চলে যাবেন। ঘটনাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এদেশের সাধারণ মানুষের জন্যে শুধু রোগের চিকিৎসাই যথেষ্ট নয়; দরকার সামাজিক কুসংস্কারগুলোর শেকড় উপড়ে ফেলা। প্রবীরদাকে চাঙা করে তোলার জন্যে তিনি আহামরি কিছু একটা করেননি বটে, কিন্তু যেটা করেছেন সেটা হল বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিসিদ্ধ চিকিৎসার প্রয়োগ।

এর পরের দু-টি নিবন্ধে পেশাগত রোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক পাটকলের মজদুর ও জরি কর্মীদের বেছে নিয়েছেন। পাটকলের মজদুরদের শ্বাসরোগ তাদের পেশার কারণেই হয়। জরি কর্মীরা ভোগেন ঘাড়ের ব্যথা, কোমরের ব্যথা, গাঁটের ব্যথা, চালশে পড়া। এছাড়া শ্বাসতন্ত্রে জীবাণু সংক্রমণ থেকে যক্ষ্মা, রিউম্যাটিক জ্বর প্রভৃতি। মানসিক রোগের মধ্যে আছে অনিদ্রা, অবসাদ ও উদ্‌বেগ।

তৃতীয় অংশে লেখক আশা করেছেন পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের ব্যাটন হাতে তুলে নেবে। কেননা এর মধ্যেই বেশ কিছু তরতাজা তরুণ-তরুণী (চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী) তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তাঁর আরও আশা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' আন্দোলন আরও পাঁচটা গণ আন্দোলনের সঙ্গে মিলেমিশে এক জোরালো ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে। স্বাস্থ্যের অধিকার সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি পাবে।

সবশেষে যে কথাটা না বললেই নয়, তা হল লেখকের অসাধারণ পরিমিতি বোধ। নিজের সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বাসকে সংযত রেখে এক ব্যতিক্রমী ডাক্তারের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও ভাবাদর্শকে যে নিরাসক্তভাবে পেশ করেছেন, তা যে নিষ্ঠ পড়ুয়ার মনে এক স্বতন্ত্র অনুরণন তুলবে; সে কথা বলতে এই আলোচকের মনে কোনো দ্বিধা নেই। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

পুস্তক সমালোচক একজন স্বাধীনজীবী পুস্তক সম্পাদক।

সবার জন্য স্বাস্থ্য

Advt.

মানে

দেশের সমস্ত মানুষ তাঁদের দরকার মতো ভালো মানের পরিষেবা পাবেন, স্বাস্থ্যের ঝুঁকি থেকে বাঁচতে পারবেন, অসুখ হলে তাঁদের আর্থিক দুর্গতিতে পড়তে হবে না, সরকার নাগরিকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেবে।

সরকারি একাধিক কমিটি হিসেব করে দেখিয়েছে এমনটা সম্ভব— যদি সরকার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ২.৫% স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে।